# ভূতপ্রেত-রক্তচোষা

অনীশ দাস অপু



# সূচিপত্র

# আতংকের দিনরাত

এক

সারা সপ্তাহ ধরে উত্তুরে হাওয়া বইবার কথা বলছিল ওরা। বিষুদবার হামলে পড়ল ঝড়। বিকেল চারটার মধ্যে আট ইঞ্চি তুষার জমে উঠল রাস্তায়, থামার কোনও লক্ষণ নেই। আমরা অভ্যাসমতো বিকেল পাঁচটা/ছটার দিকে হাজির হয়ে গেলাম হেনরির নাইট আউল-এ। ব্যাঙ্গোরের এই একটাই মাত্র দোকান যা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খোলে।

হেনরি কেউকেটা কোনও ব্যবসায়ী নয়, কলেজ ছাত্রদের কাছে বিয়ার আর মদ বিক্রি করে। আমাদের মতো অকর্মার ধাড়িদের আড্ডার চমৎকার জায়গা হেনরির বার।

আজ বিকেলে হেনরি বসেছে কাউন্টারে। আমি, বিল পেলহ্যাম, বার্টি কনরস আর কার্ল লিটলফিল্ড ঘিরে বসেছি চুল্লি। বাইরে, ওহায়ো স্ট্রিটে কোনও গাড়ি চলছে না। বৈদ্যুতিক লাঙল দিয়েও জমাটবাঁধা তুষার কাটতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। শোঁ শোঁ শব্দে বইছে প্রবল হাওয়া। ডাইনোসরের মেরুদণ্ডের মতো উঁচু আর তূপ হয়ে আছে তুষার বাড়িঘরের ছাদে।

হেনরির দোকানে আজ বিকেলে খদ্দের বলতে মোটে তিনজন–অবশ্য কানা এডিকে যদি এর কাতারে ফেলা যায়। এডির বয়স সত্তরের কাছাকাছি, পুরোপুরি অন্ধ নয় সে।

সপ্তাহে দুতিনদিন আসে সে এখানে। কোটের নিচে ব্রেড লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়, তোমাদেরকে আবার কেমন বোকা বানালাম এমন ভাব নিয়ে। হেনরি এডিকে পছন্দ করে বলে তার কাছ থেকে কখনোই রুটির দাম রাখে না।

আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাঁপটা নিয়ে। টলতে টলতে ভিতরে ঢুকল এক কিশোর। মেঝেতে পা ঠুকে জুতা থেকে বরফ ঝাড়ছে। ওকে দেখেই চিনে ফেললাম। রিচি গ্রেনাডাইনের ছেলে। চেহারায় তীব্র উৎকণ্ঠা। মুখ ফ্যাকাসে। কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে, ঘন ঘন ঢোক গিলছে বলে।

মি, পার্মালি, হেনরির উদ্দেশ্যে বলল সে, চোখের মণি ঘুরছে সকেটের মধ্যে। আপনাকে এখুনি একবার আসতে হবে। ওঁর জন্য বিয়ার নিয়ে যাব। আমি ও বাড়িতে আর ফিরতে চাই না। আমার ভয় লাগছে।

একটু সুস্থির হয়ে বসো, কসাইর সাদা অ্যাপ্রনটা খুলে রেখে কাউন্টার ঘুরে এল হেনরি। কী হয়েছে? তোমার বাবা মাতাল হয়ে গেছে?

হেনরির কথায় বুঝলাম রিচি বেশ কয়েকদিন ধরে ওর দোকানে আসছে না। প্রতিদিনই ওর একটা বিয়ার চাই, সবচেয়ে সস্তাটা কিনবে সে। বিশালদেহী, নোটকু রিচি বিয়ার খেতেও পারে। ক্লিফটনের করাতকলে কাজ করত সে। কিন্তু কী একটা ভুলের অপরাধে চাকরিটা চলে যায়। করাত-কল কোম্পানি অবশ্য ওকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। চাকরি

ছাড়ার পর থেকে সারাদিন বিয়ার খেতে খেতে আরও ফুলেছে রিচি। এখন ছেলেকে পাঠায় বিয়ার কিনতে।

বাবা মাতাল হয়েছে, শুনতে পেলাম ছেলেটা বলছে। কিন্তু সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা...সমস্যা... ওহ্ ঈশ্বর, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর।

হেনরি কার্লকে বলল, কার্ল, তুমি এদিকে দুমিনিট খেয়াল রাখতে পারবে?

অবশ্যই।

বেশ। টিমি স্টকরুমে চলো। শুনি কী হয়েছে।

ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল হেনরি। কার্ল কাউন্টারে এসে বসল হেনরির টুলে। কেউ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। আমরা হেনরির গভীর, ধীর গলা শুনতে পেলাম। টিমি উত্তেজিত ও দ্রুত কণ্ঠে কথা বলছে। তারপর কুঁপিয়ে উঠল সে।

বিল পেলহ্যাম গলা খাঁকারি দিয়ে পাইপে তামাক ভরতে লাগল।

রিচিকে অনেকদিন দেখি না। বললাম আমি।

ঘোঁত ঘোত করে উঠল বিল, তাতে কিছু আসে যায় না।

অক্টোবরের শেষে একবার এসেছিল, জানাল কার্ল। হ্যালোইনের সময়। এক কেস বিয়ার কিনল। দিনদিন ফুলে যাচ্ছিল ও।

তারপর আর কিছু বলার মতো পেলাম না। ছেলেটা এখনও কাঁদছে। তবে কাঁদতে কাঁদতে কথাও বলছে। বাইরে গর্জন ছাড়ছে বাতাস, দরজা জানালায় চাবুক কষাচ্ছে। রেডিওতে বলল সকালের মধ্যে আরও ছয় ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ পড়বে। এখন জানুয়ারির মাঝামাঝি। ভাবছিলাম অক্টোবরের পর থেকে রিচির চেহারা আদৌ কেউ দেখেছি কিনা।

আরও কিছুক্ষণ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলল হেনরি। তারপর ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছেলেটা কোট খুলে ফেলেছে তবে হেনরি তার কোট গায়ে চাপিয়েছে। ছেলেটার বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে, চোখ লাল।

হেনরিকে উদ্বিগ্ন দেখাল টিমিকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ওর খিদে পেয়েছে। আমার বউ ওকে খাইয়ে দেবে। আমি রিচির বাসায় যাব।

তোমরা কেউ আমার সঙ্গে চলো। টিমি বলল ওর বাপের বিয়ার লাগবে। টাকাও দিয়েছে। হাসার চেষ্টা করল হেনরি, কিন্তু হাসি ফুটল না মুখে।

কী বিয়ার? জানতে চাইল বার্টি। আমি নিয়ে আসি।

হ্যারোস সুপ্রিম, বলল হেনরি। কয়েকটা প্যাকেট আছে ওখানে।

আমি উঠে পড়লাম। হেনরির সঙ্গে বার্টি যাবে, আমাকেও যেতে হবে। ঠাণ্ডায় কার্লের বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। আর বিলি পেলহ্যাম এখানেই থাকছে।

বার্টি হ্যাঁরোস-এর চারটা প্যাকেট নিয়ে এল। ওগুলো বাক্সে ভরলাম। আমি। হেনরি দোতলায়, ওর বাসায় নিয়ে গেল ছেলেটাকে। টিমিকে বউয়ের কাছে রেখে নেমে এল নিচে। মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ আছে কী না। বিলি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, হয়েছেটা কী? রিচি মেরেছে। ছেলেটাকে?

না, বলল হেনরি। আমি এখনই কিছু বলতে চাই না। শুনলে পাগলের প্রলাপ মনে হবে। তবে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। টিমি বিয়ারের দাম দেয়ার জন্য যে টাকাটা এনেছে ওটা দেখো। পকেট থেকে চারটে ডলার বের করল হেনরি, রাখল কাউন্টারের কিনারে। টাকাগুলোর গায়ে ধূসর, পিচ্ছিল, ঘিনঘিনে কী একটা জিনিস লেগে আছে। কার্লকে বলল, এ টাকা কেউ যেন নাছোঁয়। ছেলেটা যা বলেছে তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয় এ টাকায় হাত দেয়া যাবে না।

মাংসের কাউন্টারে গিয়ে সিঙ্কে হাত ধুয়ে নিল হেনরি।

আমি গায়ে কোট চাপালাম, গলায় মাফলার বেঁধে নিলাম। গাড়ি নিয়ে লাভ হবে না, তুষার ঠেলে যেতে পারব না। রিচি কার্ভ স্ট্রিটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ থাকে। এখানে থেকে হাঁটা পথের দূরত্ব।

আমরা বেরুচ্ছি, বিল পেলহ্যাম বলল, সাবধানে যেয়ো। হেনরি শুধু মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁরোসের বিয়ারের কেস ছোটো একটি হ্যান্ডকার্টে রেখেছে, দরজার ধারে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

দুই

করাতের ব্লেডের মতো বাতাস যেন পোচ দিল গায়ে। মাফলারটা দিয়ে মাথা ঢেকেঢুকে নিলাম আমি। বার্টি দ্রুত মোজা পরে নিল।

আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাতে চাই না, বলল হেনরি, মুখে অদ্ভুত হাসি। তবে যেতে যেতে বলব ছেলেটার গল্প... কারণ ঘটনাটা তোমাদের জানা দরকার।

কোটের পকেট থেকে ৪৫ ক্যালিবারের একটা পিস্তল বের করল হেনরি। ১৯৫৮ সাল থেকে দিন-রাত চব্বিশঘণ্টা গুলি ভরা পিস্তলটা প্রস্তুত থাকে কাউন্টারের নিচে। একবার এক লোক মাস্তানি করতে এসেছিল হেনরির সঙ্গে। লোকটাকে পিস্তল তুলে দেখানো

মাত্র কেটে পড়েছিল সুড়সুড় করে। আরেকবার এক কলেজে পড়া ছোকরা চাঁদা চাইতে এসেছিল। তারপর এমন ভাবে সে ছুটে পালায়, যেন ভূতে তাড়া করেছে।

প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি তিনজন। কার্ট ঠেলতে ঠেলতে ছেলেটার গল্প বলল হেনরি। ছেলেটা বলেছে ঘটনার সূত্রপাত নিশ্চয়ই কোনো বিয়ারের ক্যান থেকে। কিছু কিছু বিয়ার খুব বাজে স্বাদের হয়। একবার এক লোক আমাকে বলেছিল বিয়ারের কৌটায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকলেও তা দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে দ্রুত সব কাণ্ড ঘটাতে পারে। এসব ব্যাকটেরিয়া বিয়ার খেয়ে বেঁচে থাকে।

যা হোক, ছেলেটা বলল অক্টোবরের এক রাতে রিচি গোল্ডেন লাইটের এক কেস বিয়ার কিনে বাসায় ফেরে। সে বিয়ার খাচ্ছিল আর টিমি ব্যস্ত ছিল স্কুলে হোমওয়াক নিয়ে।

টিমি ঘুমাতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেল তার বাবা বলছে, ক্রাইস্ট জেসাস, জিনিসটা ভালো না।

টিমি জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, বাবা?

ওই বিয়ার। বলল রিচি। ঈশ্বর, এরকম বাজে স্বাদের বিয়ার জীবনেও খাইনি আমি।

রিচির মতো বিয়ারখেকো মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি। একবার বিকেলে ওয়ালি স্পাতে ওকে দেখেছি বাজি ধরে বিয়ার খেতে। সে এক লোকের সঙ্গে বাজি ধরেছিল এক মিনিটে বাইশ গ্লাস বিয়ার সাবাড় করবে। স্থানীয় কেউ ওর সঙ্গে বাজি ধরার সাহস পায় না। কিন্তু এ লোকটা এসেছিল মন্টপেলিয়েরের থেকে। সে কুড়ি ডলার বাজি ধরে। রিচি তিপ্পান্ন সেকেন্ডে কুড়িটি বিয়ার সাবড়ে দেয়। তারপরও বার ছেড়ে যাওয়ার সময় ওকে বিন্দুমাত্র টলতে দেখিনি।

আমার বমি আসছে, বলল রিচি। সাবধান!

টিমি বলল, সে বিয়ারের ক্যানের গন্ধ খুঁকেছে। মনে হয়েছে ভিতরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। তারপর আর ওটার কোনও সাড়াশব্দ নেই। ক্যানের মাথায় ধূসর রঙের একটা বুদ্বুদ দেখেছে সে।

দিন দুই পরে ছেলেটা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে রিচি টিভি দেখছে। অবাক হলো সে। কারণ তার বাবা নটার আগে কখনও বাড়ি ফেরে না।

কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল টিমি।

ব্যাপার কিছু না। টিভি দেখছি, জবাব দিল রিচি। আজ আর বেরুতে ইচ্ছে করল না।

সিঙ্কের বাতি জ্বালিয়েছে টিমি, খেঁকিয়ে উঠল রিচি। বাতি নেভা!

টিমি বাতি নেভাল, জানতে চাইল না বাতি ছাড়া অন্ধকারে সে হোমওয়াক করবে কীভাবে। রিচির মেজাজ খারাপ হলে তার সঙ্গে কথা বলা যায় না।

দোকান থেকে আমার জন্য একটা বিয়ার কিনে নিয়ে আয়, হুকুম করল রিচি। টাকা টেবিলের উপর রাখা আছে।

ছেলেটা বিয়ার নিয়ে ফিরে এসে দেখে বাবা তখনও বসে রয়েছে অন্ধকারে। টিভি অফ কর। গা ছমছম করে ওঠে ছেলেটার। অবশ্য অন্ধকারে ফ্ল্যাটে বড়োসড় একটা পিণ্ডের মতো বাবাকে ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখলে কে না ভয় পাবে?

টিমি টেবিলের উপর বিয়ারের ক্যান রাখল। বাবার সামনে আসা মাত্র ভ করে পচা একটা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল তার। পচা চিজের বিটকেলে গন্ধ। কিন্তু বাবাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না টিমি। দরজা বন্ধ করে হোমওয়ার্ক নিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর শুনল টিভি চালু হয়েছে সেই সাথে বিয়ারের ক্যান খুলছে রিচি।

সপ্তাহ দুই এরকমই চলল। ছেলেটা সকালে উঠে স্কুলে যায়। স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে তার বাবা টিভির সামনে বসে ব আছে, টেবিলের উপর বিয়ার কেনার টাকা।

একদিন বিকেল চারটা নাগাদ বাসায় ফিরেছে টিমি–ততক্ষণে বাইরে কালো হয়ে এসেছে। রিচি হুকুম করল, আলো জ্বেলে দে। সিঙ্কের বাতি জ্বালল টিমি। দেখল বাবা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা।

দেখ, বলে কম্বলের নিচে থেকে একটা হাত বের করে আনল রিচি। তবে ওটা হাত নয়। ধূসর রঙের একটা মাংসপিণ্ড। আঁতকে উঠল টিমি। জিজ্ঞেস করল, বাবা, তোমার কী হয়েছে?

রিচি জবাব দিল, জানি না। তবে ব্যথা লাগছে না বরং...ভালই লাগছে।

টিমি বলল, আমি ডাক্তার ওয়েস্টফেলকে ডেকে আনি। তখন কম্বলটা ভয়ানক কাঁপতে শুরু করল, যেন ওটার নিচে প্রবল বেগে কিছু ঝাঁকি খাচ্ছে। রিচি বলল, খবরদার, ডাক্তারের কাছে যাবি না। সে চেষ্টা করলে তোকে আমি ধরে ফেলব। তারপর তোর দশা হবে এরকম। বলে মুখের উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলল রিচি।

আমরা এতক্ষণে হার্লো ও কার্ডোস্ট্রিটের মোড়ে চলে এসেছি। শুধু ঠাণ্ডা নয়, ভয়েও গা কেমন হিম হয়ে আছে আমার। এরকম গল্প হজম করা মুশকিল। তবে কি না পৃথিবীতে অনেক আজব ঘটনাই ঘটে।

জর্জ কেলসো নামে এক লোককে চিনতাম আমি। ব্যাঙ্গর পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। পনেরো বছর সে কাটিয়েছে মাটির নিচে পানির পাইপ আর বৈদ্যুতিক তার মেরামতের কাজে।

অবসর নেয়ার তখন মাত্র দুবছর বাকি। একদিন সে চাকরিটা ছেড়ে দিল। ফ্রাঙ্কি হ্যান্ডম্যান ওকে চিনতো। সে বলেছে জর্জ একদিন এসেক্সের একটি ড্রেনের পাইপ সারাতে হাসি মুখে, স্বভাবসুলভ ঠাট্টা মশকরা করতে করতে মাটির নিচে গিয়েছিল।

পনেরো মিনিট পর যখন সে উপরে উঠে এল, তার সমস্ত চুল বরফের মতো সাদা, চাউনি দেখে মনে হচ্ছিল নরক দর্শন করে এসেছে। সে সোজা ওয়ালির স্পাতে ঢুকে আকণ্ঠ মদপান শুরু করে।

মদ খেয়ে খেয়ে দুবছরের মাথায় মারা যায় জর্জ। ফ্রাঙ্কি ওর সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছিল সিউয়ার পাইপে কী দেখে ভয় পেয়েছে জর্জ। জর্জ ফ্রাঙ্কিকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কোনোদিন কুকুর সাইজের মাকড়সা দেখেছে কি না। ঘটনা কতটা সত্য আর কতটা অতিরঞ্জিত আমি জানি না, তবে পৃথিবীতে নিশ্চয় এমন ঘটনা ঘটে যা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকেও পাগল বানিয়ে ছাড়ে।

আমরা রাস্তার মোড়ে মিনিট খানিকের জন্য দাঁড়ালাম। যদিও তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসের চাবুক আছড়ে পড়ছে গায়ের উপর।

টিমি কী দেখল? জিজ্ঞেস করল বার্টিং।

টিমি বলেছে ও ওর বাবাকেই দেখেছে, জবাব দিল হেনরি। তবে সারা গায়ে ধূসর জেলি মাখা। পরনের জামাকাপড় যেন গলে গিয়ে লেগে ছিল শরীরের সঙ্গে।

ঈশ্বর! বলল বার্টি।

রিচি আবার কম্বল দিয়ে মুড়ে নেয় নিজেকে এবং বাতি নিভিয়ে দেয়ার জন্য চেঁচাতে থাকে বাচ্চাটার উদ্দেশ্যে।

ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের মতো দেখাচ্ছিল বোধহয় ওকে, মন্তব্য করলাম আমি।

হ্যাঁ, সায় দিল হেনরি। অনেকটা সেরকমই।

পিস্তলটা রেডি রেখো, বলল বার্টি।

রেডি আছে, বলল হেনরি। আমরা আবার হাঁটা দিলাম।

রিচি গ্রেনাডাইনের অ্যাপার্টমেন্ট হাউজটি পাহাড়ের প্রায় চূড়াতে, ভিক্টোরিয়ান আদলে গড়া। এগুলোকে এখন অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। বার্টি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রিচি তিনতলায় থাকে। আমি সুযোগ বুঝে হেনরির কাছে জানতে চাইলাম এরপরে বাচ্চাটার কী হলো।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে, এক বিকেলে বাচ্চাটা বাসায় এসে দেখে তার বাবা প্রতিটি জানালা চাদর দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। ঘর থেকে বদ গন্ধটার তীব্রতা বেড়েছে আরও, কেমন ফল পচা গন্ধ।

সপ্তাহখানিক ধরে রিচি তার ছেলেকে দিয়ে চুল্লিতে বিয়ার গরম করাল। ভাবা যায়? বেচারা দিনের পর দিন ওই বাড়িতে বসে চুল্লিতে বিয়ার গরম করছে আর শুনছে চুক চুক করে তা পান করছে তার বাবা।

এরকম চলল আজ পর্যন্ত। আজ বাচ্চাটা ঝড়ো হাওয়ার কারণে ছুটি পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল বাসায়।

ছেলেটি বলেছে সে সোজা ঘরে ঢুকে পড়ে, আমাদেরকে বলল হেনরি। উপরতলায় হলঘরে একটি বাতিও জ্বলছিল না–টিমির ধারণা ওর বাবা সবগুলো বাল্ব ভেঙে রেখেছে। তাই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজার সামনে আসতে হলো ওকে।

এমন সময় শুনতে পেল কিছু একটা নড়াচড়া করছে ওখানে, হঠাৎ টিমির মনে পড়ল তার বাবা সারাদিন কী করে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। বাবাকে সে গত একমাসে বলতে গেলে চেয়ার ছেড়ে নড়তেই দেখেনি। তার কি বাথরুমে যাওয়ারও প্রয়োজন হয় না!

দরজার মাঝখানে একটা ফুটো ছিল। ফুটোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে কৌশলে ছিটকিনি খুলে ফেলল টিমি। তারপর একটা চোখ রাখল ফুটোতে।

আমরা রিচির বাড়ির সামনে চলে এসেছি। আমাদের সামনে উঁচু, নোংরা একটা মুখের মতো ঝুলে আছে বাড়িটি। তিনতলার জানালা বন্ধ। অন্ধকার। যেন কেউ কালো রঙ মেখে দিয়েছে জানালায়, যাতে বাইরে থেকে ভিতরে কী হচ্ছে বোঝা না যায়।

তিন

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল টিমির। তারপর প্রকাণ্ড ধূসর একটা পিণ্ড দেখতে পেল সে, মানুষের আকৃতির মতো নয় মোটেই, মেঝের ওপর গড়িয়ে চলছে, পিছনে রেখে আসছে ধূসর, পিচ্ছিল একটা চিহ্ন। সাপের মতো একটা হাত বাড়িয়ে দিল ওটা–দেয়াল থেকে টান মেরে খুলে নিল একটা তক্তা। দেয়ালের গর্ত থেকে টেনে আনল একটা বেড়াল। এক মুহূর্ত বিরতি দিল হেনরি। তারপর বলল, একটা মরা বেড়াল। পচা। গায়ে কিলবিল করছিল সাদা সাদা পোকা...।

থামো, কাতরে উঠল বার্টি।

ঈশ্বরের দোহাই লাগে বেড়ালটা খেয়ে ফেলে রিচি।

ঢোক গেলার চেষ্টা করলাম, দলা দলা কী যেন ঠেকল গলায়। তখন টিমি এক ছুটে পালিয়ে আসে ওখান থেকে, সমাপ্তি টানল হেনরী।

ওখানে আর যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না, বলল বার্টি। হেনরি কোনও মন্তব্য করল না। বার্টি আর আমার ওপর চোখ বুলাল শুধু।

যাব, বললাম আমি। রিচির জন্য বিয়ার নিয়ে এসেছি না! বার্টি আর কিছু বলল না। আমরা সিঁড়ি বেয়ে সামনের হলরুমের দরজায় চলে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে নাকে ধাক্কা দিল গন্ধটা।

কী যে বিশ্রী, ভয়ঙ্কর বোটকা গন্ধ! বমি ঠেলে এল গলায়।

হলঘরের নিচে একটা মাত্র হলুদ বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। সিঁড়িগুলো উঠে গেছে উপরে, মিশেছে অন্ধকারে।

হেনরি তার গাড়ি থামাল। ও বিয়ারের কেস তুলছে, আমি নিচের সিঁড়ির বোতামটা চেপে ধরলাম। দোতলার ল্যান্ডিং বাল্ব জ্বলে উঠবে। কিন্তু জ্বলল না। টিমি ঠিকই বলেছে সবগুলো বাল্ব ভেঙে রেখেছে ওর বাবা।

বার্টি কাঁপা গলায় বলল, আমি বিয়ার নিয়ে যাই। তুমি পিস্তল রেডি রাখো।

আপত্তি করল না হেনরি। পিস্তল বাগিয়ে আগে আগে চলল। আমি ওর পিছনে, আমার পিছনে বিয়ার হাতে বার্টি। দোতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে এলাম, গন্ধের তীব্রতা বাড়ল আরও। পচা আপেলের গন্ধ।

প্রতিবেশীরা এই লোকটাকে লাথি মেরে দূর করে দিচ্ছে না কেন? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কীসের প্রতিবেশী? পাল্টা প্রশ্ন করল হেনরি। এ গন্ধে ভূত পালাবে। কে যাবে ওকে লাথি মেরে দূর করে দিতে?

তিনতলায় উঠছি আমরা। এ তলার সিঁড়িগুলো আগেরগুলোর চেয়ে সরু এবং খাড়া। গন্ধে নাড়িভুড়ি উল্টে আসার জোগাড়। উপরতলায় ছোটো একটি হলো, একটা দরজা দেখতে পেলাম, দরজার মাঝখানে ছোটো একটি ফুটো। বার্টি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, দেখো, কীসের মধ্যে এসেছি।

হলঘরের মেঝেতে থকথকে পিচ্ছিল একটা জিনিস, ছড়িয়ে আছে সমস্ত জায়গায়। ছোটো ছোটো গর্ত এখানে-সেখানে। মনে হলো মেঝেতে এক সময় কার্পেট পাতা ছিল, কিন্তু ধূসর জিনিসটা ওটা খেয়ে ফেলেছে।

হেনরি দরজার সামনে গেল, আমরা ওর পিছু নিলাম। বার্টির কথা জানি না, তবে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কাঁপুনি উঠে গেছে আমার। হেনরি পিস্তল দিয়ে বাড়ি মারল দরজায়। রিচি? ডাকল সে, কণ্ঠ শুনে মনে হলো না একচুলও ভয় পেয়েছে। যদিও মুখ কাগজের মতো সাদা। আমি নাইট আউল-এ হেনরি পার্মালি। তোমার বিয়ার নিয়ে এসেছি।

পুরো এক মিনিট কোনও সাড়া নেই, তারপর বলে উঠল একটা কণ্ঠ, টিমি কোথায়? আমার ছেলে কই? ভয়ের চোটে প্রায় দৌড় দিতে যাচ্ছিলাম। ওটা মোটেই মানুষের কণ্ঠ নয়। ঘরঘরে, অপার্থিব, ভৌতিক একটা আওয়াজ।

ও আমার দোকানে আছে, বলল হেনরি। খানা খাচ্ছে। ও না খেতে পাওয়া বেড়ালের মতোই হাড্ডিসার হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত কিছুই শোনা গেল না, তারপর ভয়ঙ্কর একটা ঘরঘরে শব্দ ভেসে এল। আত্মা কাঁপিয়ে দেয়া গলাটা দরজার ওপাশ থেকে বলল, দরজা খুলে বিয়ারটা ভিতরে ঠেলে দাও। আমি খুলতে পারব না।

এক মিনিট, বলল হেনরি। এ মুহূর্তে তোমার কী অবস্থা, রিচি?

তা দিয়ে তোমার দরকার নেই, বলল কণ্ঠটা, বিয়ার দিয়ে চলে যাও।

মরা বেড়ালে আর চলছে না, তাই না? বলল হেনরি। হাতে বাগিয়ে ধরল পিস্তল।

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল হেনরির কথাটা শুনে। গত তিন সপ্তাহে দুটি তরুণী আর এক বুড়ো সৈনিক নিখোঁজ হয়েছে–সকলেই সন্ধ্যার পরে।

হয় বিয়ার দাও, নয়তো আমি নিজেই বেরিয়ে আসব, বলল ভয়ঙ্কর কণ্ঠ। হেনরি আমাদেরকে ইশারা করল পিছু হঠতে। আমরা তাই করলাম। ইচ্ছে হলে আসতে পারো, রিচি, পিস্তল ক করল হেনরি।

ঠিক তখন প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল রিচি। তারপর এক সেকেন্ড, মাত্র এক সেকেন্ড দৃশ্যটা দেখলাম, তারপর তিন তলা থেকে লাফাতে লাফাতে নিচে

চলে এলাম আমি আর বার্টি এককেবারে চার/পাঁচটা সিঁড়ি টপকে। বরফের উপর ডিগবাজি খেয়ে পড়লাম। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দিলাম ছুট।

ছুটতে ছুটতে শুনলাম হেনরির পিস্তলের আওয়াজ। পরপর তিনবার। আমি এক বা দুই সেকেন্ডের জন্য যে দৃশ্য দেখেছি তা জীবনেও ভুলব না। জেলির প্রকান্ড একটা ঢেউ, অনেকটা মানুষের আকারের: থকথকে, পিচ্ছিল একটা জিনিস পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছিল।

তবে ওর চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল। ওটার চোখ হলুদ, বুনো, আর সমতল, তাতে মানুষের আত্মার চিহ্ন নেই। তবে চোখ দুটো নয়। চারটে। জিনিসটা মাঝখানে, দুজোড়া চোখের মধ্যে সাদা, আঁশের মতো গোলাপি মাংসখণ্ড কিলবিল করছিল।

ওটা ভাগ হয়ে যাচ্ছিল একটা থেকে দুটো। আমি আর বার্টি দোকানে ফিরে এলাম একটি বাক্য বিনিময় না করে। জানি না ও কী ভাবছে, তবে আমার দুই ঘরের নামতা মনে পড়ে যাচ্ছিল। দুদুগুণে চার, চার দুগুণে আট দুদুগুণে ষোলো, মোলো দুগুণে...।

আমাদেরকে দেখে লাফিয়ে উঠল কার্ল আর বিল পেলহ্যাম। ঝড়ের বেগে প্রশ্ন করতে লাগল। তবে দুজনের কেউ কিছু বললাম না। অপেক্ষা করছি হেনরির জন্য। ও ফিরে আসে নাকি তাই, দেখব। আশা করি হেনরিই ফিরে আসবে।

# উন্মাদ

মরচে ধরা লোহার গেটটা ধাক্কা দিল রোজালিন। কা-আ-আচ শব্দে খুলে গেল ওটা। সদর দরজার দিকে পা বাড়াল রোজালিন। দরজার মাথায় লাইলাকের ঘন ঝাড় ঝুলছে; গন্ধটা মিষ্টি তবে কেমন যেন দম বন্ধ করে দেয়।

পেতলের ভারী কড়া ধরে নাড়ল রোজালিন। কয়েক সেকেণ্ড পরে খুলে গেল দরজা।

রোজালিন, সত্যি তুই? কত্ত বড়ো হয়ে গেছিস! চেনাই যাচ্ছে না! ওকে জড়িয়ে ধরলেন হ্যারিয়েট ফুপু। তাঁর গা থেকেও লাইলাকের গন্ধ আসছে।

কেমন আছ, ফুপু? জিজ্ঞেস করল রোজালিন।

ভাল। আয়, ভেতরে আয়, মা। গরমে একদম ঘেমে গেছিস। ঘরে ঠাণ্ডা আছে।

রোজালিন ফুপুর পিছু পিছু একটি বড়ো, অন্ধকার হলওয়েতে ঢুকল। মাটির নিচের গুহার মতোই শীতল হলঘর।

কতদিন পরে দেখলাম তোকে! পনেরো বছর তো হবেই। ট্রেনে কোনো কষ্ট হয়নি তো? জবাবের অপেক্ষা না করে বকবক করেই যেতে লাগলেন ফুপু। তোর বাবাকে কতবার

লিখেছি তোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। তোর বাবা তোর ফুপাকে পছন্দ করে না জানি। কিন্তু তোর ফুপাও তো মারা গেছে চার বছর হলো... বিরতি দিলেন হ্যারিয়েট ফুপু। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আর্থার আত্মহত্যা করেছে চার বছর হলো। রোজালিন নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকল। কী বলবে বুঝতে পারছে না। বাবা ওকে বলেছেন হ্যারিয়েট ফুপু একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। ঠিকই বলেছেন।

তোমাদের বাড়িটি খুব বড়ো, ফুপু, বলল রোজালিন।

মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। তারপর বাড়িটি তোকে ঘুরিয়ে দেখাব। চল, তোর শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই, তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

কে কথা বলে? অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল রোজালিন। খনখনে গলায় হেসে উঠলেন ফুপু। গায়ে কাঁটা দিল রোজালিনের। ফুপু হলওয়েের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেলেন। সবুজ ভেলভেটের কাপড় সরাতেই একটা খাঁচা দেখতে পেল রোজালিন। খাঁচার ভেতরে একটি কাকাতুয়া।

ওর নাম পলি, তাই না, পলি? পাখির মতো কিচকিচ শব্দ করলেন হ্যারিয়েট ফুপু।

পাখির খাঁচার ধারে গেল না রোজালিন। সে কাকাতুয়া একদম পছন্দ করে না। ফুপু, আমি বরং আমার ঘরে যাই।

হ্যাঁ, চল, চল... আমি এক্ষুনি ফিরছি, পলি, বললেন ফুপু।

রোজালিনকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলেন মিসেস হ্যারিয়েট। হলঘরের শেষ মাথার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এটা তোর ঘর, রোজালিন। আশা করি পছন্দ হবে। বিয়ের সময় এটা বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতাম।

ভেতরে উঁকি দিল রোজালিন। গোটা ঘরে লাইলাকের ছড়াছড়ি। বিছানার চাদরে উজ্জ্বল রঙের লাইলাকের ছাপা; ওয়াল পেপারে সাদা লাইলাক। এমনকি আসবাবগুলোর গায়েও তাই।

তুই একটু বিশ্রাম নে, রোজালিন। তারপর নিচে আসিস, একসঙ্গে চা খাব।

মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল রোজালিন। বিশ মিনিট পরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। ফুপুর সঙ্গে চা খাবে। মূল হলওয়েতে সূর্যালোকিত একটি ঘরে ভাতিঝির জন্য অপেক্ষা করছিলেন হ্যারিয়েট ফুপু। সোফার পাশের ছোটো টেবিলে চা এবং কেক সাজিয়ে রাখা।

কেকগুলো ঘরে বানানো, রোজালিন, বললেন ফুপু। তুই এসেছিস খুব খুশি হয়েছি। মাঝে মাঝে এমন একা লাগে! পলি আর আমি একা বসে বেশিরভাগ সময় খাই। তাই না, পলি?

একা খাই, কর্কশ গলায় বলে উঠল পলি। রোজালিন লক্ষ করল খাঁচাটি জানালার ধারে বসানো হয়েছে।

রোজালিন কেক খেল। স্বাদ ভালোই। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঘরে চোখ বুলাতে লাগল। আসবাবগুলো মান্ধাতা আমলের। ল্যাম্পগুলো শেড থেকে ঝুলে আছে, তাতে ক্রিস্টালের পুঁতি। চেয়ার কভারগুলো মখমলের। দেখেই বোঝা যায় অনেক পুরোনো, ভাজ খেয়ে রয়েছে নানা জায়গায়। ছোটো ছোটো অসংখ্য স্ট্যাচু এবং ছবি সারা ঘর জুড়ে। একটা ছবিতে নজর আটকে গেল রোজালিনের। ও কি আমার ফুপাতো ভাই হারম্যান?

হাহাকারের মতো একটা শব্দ বেরুল ফুপুর গলা দিয়ে।

সরি, ফুপু। আমি বুঝতে পারিনি তুমি কষ্ট পাবে, বলল রোজালিন। বিব্রত বোধ করছে। সে শুনেছে হারম্যান খুব অল্প বয়সে মারা গেছে। ছেলের মৃত্যুর মাসখানেক বাদেই আত্মহত্যা করেন আর্থার ফুপা। ফুপুর সঙ্গে রোজালিন কিংবা তার বাবার যোগাযোগ শুধু

টেলিফোন এবং চিঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রোজালিনের বাবার কোনো ভাই নেই, বোন এই একজনই–হ্যারিয়েট।

সে সান্ত্বনার সুরে বলল, তুমি তো জানোই ফুপু, হারম্যান ভাইয়ার জন্য কীরকম টান ছিল আমার। যদিও কোনোদিন দেখিনি ওকে... কিন্তু আমাদের জন্ম তো একই বছরে। ও মারা গেছে শুনে খুব কেঁদেছিলাম আমি।

ফুপু সামলে নিয়েছেন নিজেকে। হারে, ওটা তোর হারম্যান ভাইয়ারই ছবি। যাক, বাদ দে। যা গেছে গেছে। ও নিয়ে আর মন খারাপ করতে হবে না। চল, তোকে বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাই।

রোজালিন তার ফুপুর পেছন পেছন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার সেই অন্ধকার হলওয়েতে ঢুকল।

তোকে আগে তোর আর্থার ফুপার পড়ার ঘর এবং ল্যাবরেটরি দেখাব। তুই তো জানিস, আর্থার খুব বড়ো মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন। সবসময় সময়ের আগে এগিয়ে থাকতেন। ইউনিভার্সিটির লোকজন তাকে ঈর্ষা করত। এ জন্য ভার্সিটির চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে গবেষণা শুরু করেছিলেন তিনি।

একটি প্রকাণ্ড ঘরে ঢুকল ওরা। এ ঘরে শুধু বই আর বই। রোজালিন অবাক চোখে চারদিক দেখছে। এখানে বসে আর্থার ফুপা কাজ করতেন। শুনেছে তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন। তবে বাবা কখনোই ফুপার বিষয়ে কোনো কথা বলত না। রোজালিন শুনেছে কী একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছিল ফুপাকে।

আর এদিকে, একটা দরজা দেখালেন ফুপু। তোর ফুপার গবেষণাগার।

পরের ঘরটা কেমন গা ছমছমে। ঘরভর্তি নানান কাঁচের জার, টেস্টটিউবসহ বৈজ্ঞানিক আরও জিনিসপত্র। জারগুলোর গায়ে বিভিন্ন লেবেল সাঁটানো। ভেতরে কেমিকেল।

আর্থার ফুপা কী নিয়ে গবেষণা করতেন? জিজ্ঞেস করল রোজালিন।

উনি জীববিজ্ঞানী ছিলেন, বিরাট বায়োলজিস্ট, সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন হ্যারিয়েট ফুপু। হিউম্যান মিউটেশন মানে মানব দেহের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতেন।

ও আচ্ছা, বলল রোজালিন। দেয়ালে চোখ বুলাল। ওখানে গরিলা এবং বানরের পাশাপাশি মানুষের শরীরের ছবিও ঝুলছে।

রোজালিন, একটা কথা এ দুটি ঘরের কোনো কিছুতে হাত দেয়া যাবে। আমার স্বামীর কাজের নিদর্শন রয়ে গেছে এ ঘর দুটিতে। একদিন বিজ্ঞান বুঝতে পারবে উনি কতটা প্রতিভাবান ছিলেন। এ ঘর দুটি যেমন আছে সবসময় তেমন থাকবে।

অবশ্যই ফুপু, বলল রোজালিন। ফুপুর পেছন পেছন স্টাডিরুম হয়ে আবার চলে এল হলঘরে।

বাড়ির বাকি ঘরগুলো তুই নিজেই ঘুরে দেখতে পারবি, রোজালিন, বললেন ফুপু। তবে চিলেকোঠায় ভুলেও যাবি না। তাঁর কণ্ঠ কঠিন শোনাল। আমার কথা বুঝতে পেরেছিস?

আমার কথা বুঝতে পেরেছিস? পাশের ঘর থেকে পুনরাবৃত্তি করল কাকাতুয়া।

আমি কিন্তু খুব সিরিয়াস, রোজালিন। চিলেকোঠার দরজা ভুলেও খুলবি না। খুললে পস্তাবি।

খুললে পস্তাবি, ক্যাকক্যাক করে উঠল পলি।

শিরশির করে উঠল রোজালিনের গা। বুঝতে পেরেছি, ফুপু।

রোজালিন একা একাই ঘুরে দেখল বাড়ি। পুরোনো বইয়ের অভাব নেই বাড়িতে। সেসব উল্টে পাল্টে দেখল। রাতে ফুপুর সঙ্গে বাগানে বসে চা খেল। রোজালিনের বাবার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করলেন ফুপু। রোজালিন যখনই হারম্যান সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছে, প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন হ্যারিয়েট ফুপু।

এ বাড়িতে বেড়াতে আসার চতুর্থ দিনে ফুপু জানালেন তিনি আজ বিকালে বাসায় থাকছেন না। এক বান্ধবীর বাড়িতে চায়ের দাওয়াত আছে, সেখানে যাবেন। রোজালিনের মন চাইলে যেতে পারে।

কিন্তু রোজালিন যেতে চাইল না। বুড়ো মানুষদের আড্ডা তার ভাল্লাগে না। ফুপুকে জানাল সে বাড়িতেই থাকবে। বাগানে বসে বই পড়ে কাটাবে সময়।

ফুপু চলে যাওয়ার পরে নিজের ঘরে ঢুকল রোজালিন। সঙ্গে নিয়ে আসা একটা হরর বই পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের কাহিনি তাকে আকৃষ্ট করতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে ফেলল রোজালিন। সিধে হলো। বেরিয়ে এল হলঘরে। কী করা যায় ভাবছে। কিন্তু করার মতো কোনো কাজ নেই। ফুপুর বাড়িতে গরমের ছুটিটা কাটছে খুবই বিরক্তিকরভাবে। রোজালিন আসতে চায়নি। কিন্তু বাবা একরকম জোর করে পাঠিয়েছেন ওকে। তিনি ব্যবসার কাজে অস্ট্রেলিয়া যাবেন। নরফোকের বাড়িতে রোজালিন একা থাকবে, ব্যাপারটা ভালো লাগছিল না তাঁর। ওদিকে তাঁর বড়ো বোন

হ্যারিয়েট মাঝে মাঝেই ফোন করে হুকুম দিয়েছেন এবারের ছুটিতে রোজালিনকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

দুলাভাইকে পছন্দ না করলেও বড়ো বোনকে ভয় পান রোজালিনের বাবা। তাই তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেননি। রোজালিনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফুপুর বাড়ি। কিন্তু এত বড়ো বাড়িতে সঙ্গীহীন ষোড়শী রোজালিনের মন হাঁপিয়ে উঠছে।

হলঘর ধরে হাঁটছে রোজালিন, চোখ চলে গেল চিলেকোঠার দরজায়। দরজার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল সে। হ্যারিয়েট ওকে পই পই করে মানা করেছেন চিলেকোঠার ধারে কাছেও যেন না যায় রোজালিন। এর মধ্যে কী রহস্য আছে... রোজালিনের খুব কৌতূহল হলো রহস্য ভেদ করবে। ফুপুর সাবধান বাণী জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিল। দরজার নবে হাত রাখল। মোচড় দিল। মোচড় খেল নব। তার মানে তালা মারা নেই। কিন্তু রোজালিন ডোরনব থেকে সরিয়ে নিল হাত। দ্বিধায় ভুগছে। ফুপু বলেছেন এ ঘরে না যেতে।

চলে যাচ্ছিল রোজালিন। কিন্তু কৌতূহলের জয় হলো। হ্যারিয়েট ফুপু পাগলাটে স্বভাবের মানুষ, রোজালিনের বাবা আগেই ওকে সাবধান করে দিয়েছেন, পাগল মানুষ কত উদ্ভট কথাই তো বলে। তাদের সব কথা বিশ্বাস করা বোকামি।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রোজালিন। ডোরনবে আবার হাত রাখল ও, মোচড় দিল জোরে। তারপর ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। কতগুলো সিঁড়ি উঠে গেছে চিলেকোঠায়। রোজালিন ধীর পায়ে বাইতে লাগল সিঁড়ি। চিলেকোঠার মেঝের সমান্তরালে ও এসেছে, একটা দৃশ্য দেখে জমে গেল। ও বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা অর্ধ মানব, অর্ধ জানোয়ারের দিকে। ভয়ঙ্কর প্রাণীটা কটমট করে চেয়ে আছে রোজালিনের দিকে। মুখ দিয়ে আর্তচিৎকার বেরুল রোজালিনের। হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে।

অসুস্থ বোধ করছে রোজালিন। যা দেখেছে বিশ্বাস করতে চাইছে না। মন। কী ভয়ঙ্কর দানব! চিলেকোঠার দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে দৌড়াল রোজালিন। তারপর শুনতে পেল সেই শব্দ যার ভয় পাচ্ছিল এতক্ষণ। থপ থপ থপ। চিলেকোঠার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে ওটা–পিছু নিয়েছে রোজালিনের।

রোজালিনের মনে হলো হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। হলো ল্যাণ্ডিং-এ সৃষ্টি ছাড়া জীবটাকে দেখতে পেল ও। দৌড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। কুৎসিত প্রাণীটা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। কালো, ঘন লোমে বোঝাই একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ছুটল রোজালিন।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে আরেকটু হলে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। পিশাচটা ওর পেছন পেছন আসছে। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে ওটা। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রোজালিন। ও একছুটে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে।

এক সেকেণ্ডের মধ্যেই বুঝে ফেলল রোজালিন এ ঘর থেকে বেরুবার রাস্তা নেই। আবার দরজা লক্ষ্য করে ছুটল। থাবা চালাল জানোয়ার। অল্পের জন্য মিস হলো টার্গেট। বাউলি কেটে বেরিয়ে এল রোজালিন।

হলঘর ধরে কিচেনের দিকে ছুটল রোজালিন। কদাকার অন্ধকারের প্রাণীটা টলতে টলতে ওর দিকেই আসছে। ওটার মুখ মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল রোজালিন। ওটার চেহারা অনেকটা মানুষের মতো–এজন্যই অস্বস্তি বেশি লাগছে ওর। রান্নাঘরের খিড়কির দরজা খুলে বারান্দায় চলে এল রোজালিন। কিন্তু যখন বুঝতে পারল বাগান থেকে বেরুবার রাস্তা নেই, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

বাগানের পাথুরে দেয়ালে পিঠ চেপে ধরল রোজালিন। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বীভৎস প্রাণীটা, এগোচ্ছে রোজালিনের দিকে। কুৎসিত মুখে নোংরা হাসি। আবার থাবা চালাল ওটা। আরেকবার বাউলি কেটে টার্গেট মিস করে দিল রোজালিন।

কিন্তু ওটা রোজালিনের অনেক কাছে চলে এসেছে। রোজালিন রান্নাঘরে ছুটল। সেখান থেকে হলঘরে। তবে সদর দরজায় পৌঁছাতে পারল না। তার আগেই কীসের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

ভয়ঙ্কর জীবটা রোজালিনের সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িয়ে দিল রোমশ হাত। রোজালিনের মাথা স্পর্শ করল।

তুমি এসেছ, বলল ওটা মানুষের গলায়।

তুমি এসেছ, খাঁচায় বসে ভেংচাল কাকাতুয়া। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল রোজালিন।

.

জ্ঞান ফিরে পেল রোজালিন, চোখ মেলে চাইতেই চমকে গেল ভয়ানক। সৃষ্টিছাড়া জীবটা এখনও ঝুঁকে দেখছে ওকে। তার পাশে হ্যারিয়েট ফুপু।

রোজালিন, তুই একটা বাজে মেয়ে। মানা করেছিলাম না চিলেকোঠার ধারে কাছেও ঘেঁষবি না। বলেছিলাম ওখানে গেলে পস্তাবি। রাগে রোজালিনের দিকে আঙুল তুলে নাড়লেন তিনি। তোর কারণে ভয় পেয়েছে বেচারা হারম্যান।

বেচারা হারম্যান, পুনরাবৃত্তি করল কাকাতুয়া।

হ্যাঁ, বেচারাই তো, বললেন ফুপু, আদর করে নেড়ে দিলেন ছেলের মাথার চুল। আর্থার ওকে নিয়ে কত এক্সপেরিমেন্ট করল অথচ ও আর

আগের চেহারা ফিরে পেল না।

রোজালিনের দিকে ফিরলেন হ্যারিয়েট ফুপু। তোকে আর আমরা ছাড়তে পারব না, রোজালিন। কারণ তুই এখন আমাদের গোপন কথা জেনে ফেলেছিস। তোর বাবা অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে তোর খবর নেয়ার জন্য ফোন করলে জানিয়ে দেব তুই আমাদের এখানে আসিসইনি। আমরা চিলেকোঠায় ওর জন্য চমৎকার একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারব, তাই না, হারম্যান?

উন্মাদ ফুপুর দিকে তাকাল রোজালিন। তারপর চাইল ফুপাত ভাইয়ের দিকে। হারম্যানের কদাকার চেহারায় জান্তব উল্লাস।

আমাদের সঙ্গ তোর মন্দ লাগবে না, রোজালিন। বললেন ফুপু।

মন্দ লাগবে না, ক্যাকক্যাক করল কাকাতুয়া।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল রোজালিন। তারপর জ্ঞান হারাল আবার।

হারম্যান ওর অচেতন দেহ আলগোছে তুলে নিল কোলে, তারপর চলল চিলেকোঠার সিঁড়ি অভিমুখে।

# ঘুমালেই বিপদ!

ভোর চারটা বাজে। কিন্তু এখনও ঘুমাতে সাহস পাচ্ছি না।

আমার বর্তমান দুর্দশার শুরু মাস তিনেক আগে, যেদিন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি।

বাবা মারা যাওয়ার দুবছরের মধ্যে তাঁর জমানো সমস্ত টাকা উড়িয়ে দিই আমি। ছোটোখাটো চাকরি করতাম মাঝে মাঝে আর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবতাম আমার পছন্দের ঘোড়াগুলো যদি আরেকটু জোরে ছুটতে পারত, কত ভালোই না হতো।

অভাব অনটনে জর্জরিত আমি যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল, সিদ্ধান্ত নিলাম এ জীবন আর রাখব না। এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। আর আত্মহত্যার জন্য টিউব রেলওয়ে উৎকৃষ্ট স্থান। রেল লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকো, ব্যস- তোমার সব দুঃখ-কষ্ট কাটা পড়ে যাবে রেল গাড়ির চাকার নিচে।

আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে অটল আমি সেদিনও সান্ধ্যকালীন পত্রিকা কেনার লোভ সামলাতে পারিনি। চলন্ত সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে কিনে ফেললাম সেদিনকার খবরের কাগজ। আগামীকাল বিকেল চারটায় যে ঘোড়দৌড়টা হবে, সে রেসের একটা ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলাম আমি। যদিও জানি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনন্ত লোকের

উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়ে যাবে আমার। তবু কোন্ কোন্ ঘোড় রেসে অংশ নিচ্ছে জানার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। যদিও এই চতুস্পদ প্রাণীগুলোর ওপরে বাজি ধরতে গিয়েই গত দু বছরে ফতুর হয়ে গেছি।

যে লোকটার কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনেছি সে আকারে ছোটোখাট, গালে মাফলার জড়ানো। কাপড়ের টুপিটা চোখ প্রায় ঢেকে রেখেছে। তার কাছে একটিই মাত্র কাগজ ছিল। তার হাত থেকে কাগজ নেয়ার সময় শিরশির করে উঠল গা। ইচ্ছে করে সে যেন ছুঁয়ে দিয়েছিল আমার হাত। তার আঙুলগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা।

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় স্টপ প্রেস লেখাটিতে চোখ বুলালাম আমি।

ওতে লেখা বেলা সাড়ে চারটার রেসে কাম এরর নামে একটি ঘোড়া দৌড়ে জিতেছে। আমার বুকি নিশ্চয় রেগে আগুন হয়ে যাবে দেখে আমি রেসে হাজির হইনি।

হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল ব্যাপারটার মাজেজা বুঝতে পেরে। কাম এরর-এর রেস তো আজ নয়, কাল বিকেলে। ঘোড়াটার জেতার খবর আগাম ছেপে দিয়েছে এ পত্রিকা।

কপাল কুঁড়ে ঘাম বেরুল। পত্রিকাটি ফেলে দিয়েছিলাম। তুলে নিলাম আবার। হাত কাঁপছে আমার বেলা দুটোর রেসে কোন ঘোড়া জিতল দেখতে গিয়ে।

এটি একটি কোল্ট। এ ঘোড়ার নামও শুনিনি।

আগামী দিনের খবরের কাগজ নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি আমি। কিন্তু এ পত্রিকাটি সেগুলো থেকে আলাদা...

আমার পত্রিকায় আগামীকালের তারিখ লেখা!

স্টেশনের প্রবেশ পথে চলে এলাম। যে লোকটা কাগজ বিক্রি করেছে, খুঁজছি তাকে। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই। ফল বিক্রেতা এক ছোঁড়াকে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলাম। এরকম কাউকে তার চোখে পড়েছে কিনা।

এখানে কোনো হকারকে আজ দেখি নাই, ভাই, ভুরু কুঁচকে বলল সে। কোনো খবরের কাগজঅলাই আজ পত্রিকা বিক্রি করতে আসে নাই। আমি চলে এলাম ওখান থেকে।

বলাবাহুল্য সুইসাইড করিনি আমি। বদলে ফিরে এলাম বাড়ি। আগামীকালের পত্রিকার আদ্যোপান্ত চষে ফেললাম। পরদিন বিকেলের রেসের বিজয়ী ঘোড়াগুলো সম্পর্কে নোট টুকে নিলাম কাগজে, স্টক এক্সচেঞ্জের দাম লিখলাম, এমনকী কাল সন্ধ্যায় গ্রেহাউণ্ড রেসে কারা কারা জিতছে তাদের খবরও পড়ে ফেললাম অভিভূত বিস্ময়ে।

নাচতে নাচতে বিছানায় গেলাম আমি। আগামীকাল থেকে লসগুলো পূরণ করব আমি। আপনি যদি আগেভাগে জানতে পারেন ছটা ঘোড়দৌড়ে কোন্ কোন্ ঘোড়া জিতবে, আপনাকে ঠেকায় কে? একদিনেই তো আপনি আপনার বিনিয়োগকৃত টাকার কয়েকগুণ ঘরে তুলে আনতে পারবেন। এবং তা-ই করলাম আমি।

পরদিন সন্ধ্যায় যথারীতি চলে এলাম টিউব স্টেশনে। একটা ফ্যাসফেসে কণ্ঠ বলল, পেপার, স্যার!

সেই বেঁটে লোকটাই, গালে জড়ানো মাফলার, ক্যাপটা এমনভাবে টেনে নামানো, চোখ দেখা যায় না। তার ঠাঠা আঙুল ঘষা খেল আমার হাতে। লক্ষ করলাম লোকটার কাছে একটাই মাত্র কাগজ।

আচ্ছা... বলতে গেলাম আমি, বাধা পেলাম পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে। স্টেশন থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসছিল একজন, আমাকে ধাক্কা মেরে হনহন করে এগোল সামনে। তাল সামলে পেছন ফিরলাম। নেই কাগজঅলা।

আমি এখন প্রতিটি রেসে জিতি। সেই সঙ্গে আমার স্টক ব্রোকারের কাছ থেকেও প্রচুর টাকা কামাই। কারণ আগেই বলে দিই স্টক এক্সচেঞ্জে কোন কোম্পানির দর নামবে, কোনটা উঠবে। রেস শেষে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটায় চলে আসি টিউব স্টেশনে, সেদিনের

কাগজ কিনতে। এবং প্রতি সন্ধ্যায় মুখে মাফলার পেঁচানো কাগজঅলা বন্ধুটিকে পেয়ে যাই। তার হাতে একটিই মাত্র কাগজ থাকে আমার কাছে বিক্রি করার জন্য।

দ্রুত ধনী হয়ে যাচ্ছি আমি। আবার জেনির পাণিপ্রার্থনা করলাম। যখন ধ্বংসের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, ভেবেছি ইহজীবনে জেনির সঙ্গে দেখা হবে না আমার।

জেনির বাবা মালদার পার্টি। একমাত্র মেয়েকে মধ্যবিত্ত কারও হাতে তুলে না দেয়ার ব্যাপারে কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে এখন যেহেতু আমার টাকা আছে, তার জামাই হওয়ার দুঃসাহস দেখাতেই পারি। কারণ জানি আমি যদি জেনিকে বিত্তবৈভবের মধ্যে রাখতে পারি, এ বিয়েতে আপত্তি করবেন না ওর বাবা। আমার এখন জেনির বাবার চেয়েও বেশি টাকা এবং দিন দিন ব্যাংক ব্যালান্স বেড়েই চলেছে, সত্যি বলতে কী, আমি পরিণত হয়েছি টক অব দ্য টাউনে। সবার আলোচনার বিষয়বস্তু এখন আমি। কাজেই ওদের বাসায় যেদিন গেলাম, সাদর সম্ভাষণ জানাল পিতা ও কন্যা।

সেন্ট মার্গারেট চ্যাপেল বিয়ের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য ধার্য করা হলো। সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুইজারল্যান্ডে যাব মধুচন্দ্রিমায়।

টিউব স্টেশনে প্রতিদিন ক্ষুদ্র মানুষটির কাছ থেকে খবরের কাগজ কিনি আমি। এটা এখন রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে। আগে ভাবতাম জানব লোকটা কেন, কোত্থেকে এসেছে, কী তার পরিচয়। তার কাছে শুধু একটিই মাত্র পত্রিকা কেন থাকে এবং আমি স্টেশনে

হাজির হওয়া মাত্র কাগজটা কেন সে তুলে দেয় আমার হাতে। কিন্তু লোকটার কাছ থেকে পত্রিকা কেনা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাই না।

বিয়ের আগের দিন সিদ্ধান্ত নিলাম আর পত্রিকা কিনব না। স্টক এবং শেয়ারের দৌলতে আজ আমি দেশের শীর্ষস্থানীয় ধনীদের কাতারে। কাল বিকেল আড়াইটায় কোন্ ঘোড়া রেসে জিতবে, এ খবর জানার আমার এখন আর প্রয়োজন নেই।

জেনিকে কাল বিয়ে করছি আমি। এরপর ওই বেঁটে, নোংরা লোকটার স্মৃতি চিরতরে দূর করে দেব মন থেকে। লোকটার ঠাণ্ডা আঙুলের স্পর্শে ভীতিকর শিহরণ থেকে মুক্ত থাকব।

তবু যথারীতি টিউব স্টেশনে হাজির হয়ে গেলাম আমি। না, রেসের কোন্ ঘোড়া জিতবে জেনে আরও টাকা কামাই করতে নয়, কৌতূহল জাগছে পত্রিকায় আমার বিয়ে নিয়ে কী খবর ছেপেছে দেখতে।

লোকটার হাতে যথারীতি সেই একটাই কাগজ। আমি কাগজটা তার হাত থেকে নিয়েছি, এই প্রথমবার সে আমার দিকে মুখ তুলে চাইল। তার কোটরাগত চোখের রঙ ধূসর, গাল চাপড়া ভাঙা। সে আজ মাফলার জড়ায়নি মুখে। মুখটা ভয়ঙ্কর মুখোশের মতো। আমি নিজের অজান্তে পিছিয়ে এলাম এক কদম, শিরদাঁড়া বেয়ে নামল ঠান্ডা বরফ জল। লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি, মুখে ভৌতিক হাসি ফুটল তার, লম্বা, হাড্ডিসার হাতখানা

স্যালুটের ভঙ্গিতে তুলল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। মিশে গেল টিউব স্টেশনের জনতার ভিড়ে।

কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলাম আমি। তবে ঘরে ঢুকে জোর করে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিতে চাইলাম লোকটার চিন্তা। ওকে ভয় পওয়ার কী আছে? ওর সঙ্গে তো ইহজীবনে দেখা হবে না আমার। কারণ ওর কাছ থেকে আর খবরের কাগজ কিনতে যাচ্ছি না আমি। লোকটা হয়তো জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা। তাই স্যালুটের ভঙ্গিতে বিদায় জানিয়েছে আমাকে।

খবরের কাগজ খুললাম। আগ্রহ নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছি। বিয়ে বিষয়ক কোনো খবরই নেই। অথচ বহু সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে আমি এবং জেনি জানিয়েছি কবে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছি দুজনে।

কাগজের তারিখটা দেখলাম। হ্যাঁ, এটা আগামীকালের খবরের কাগজই। কিন্তু বিয়ে সংক্রান্ত কোনো খবর ছাপেনি।

হঠাৎ প্রথম পাতার একটি খবরে আটকে গেল চোখ।

ঘুমের মধ্যে বরের মৃত্যু হেডলাইনে লেখা।

বুকের মধ্যে ঘোড়ার মতো লাফাতে শুরু করল কলজে। দপদপ করতে লাগল কপালের শিরা। রক্তচাপে ফুলে উঠল।

পড়লাম আমি ঘুমের মধ্যে মারা গেছি, আমার চাকর আমাকে দেখেছে চেয়ারে বসে আছি আমি ধোপদুরস্ত পোশাক পরে, হাতে কলম। মৃত্যুর কারণ ধারণা করা হয়েছে হার্ট ফেইলিওর।

তাই আমি এ লেখাটা লিখছি জেগে থাকার জন্য। বিয়ের আর কঘণ্টা বাকি। এটুকু সময়... আমার... জেগে... থাকতে...

# তৃতীয় রাত

পাহাড়ি নদীটা ভীষণ খরস্রোতা। ছোটো স্টিমার কিংবা ইয়ট দ্বীপের গায়ে ভেড়ানো খুবই কঠিন। আটলান্টিকে গিয়ে পড়া নদীটার মোহনাও অনেক চওড়া। এপার থেকে ওপারের কিছুই দেখা যায় না। আর যা ঘূর্ণি দেখলে ভয়ে হিম হয়ে আসে রক্ত।

উজানে চলেছি আমরা। খুব সাবধানে না এগুলো যে কোনো মুহূর্তে ভয়ানক বিপদ ঘটে যেতে পারে। মাঝে মাঝে ডুবো চরাও আছে। স্টীমার আটকে যাওয়ার ষোলআনা আশঙ্কা। নকশা দেখে অত্যন্ত সাবধানে বা তীর ঘেঁষে এগুতে লাগলাম আমরা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও দ্বীপ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে থাকতেই ওরকম এক চরায় আটকে গেল স্টিমার। ভাবছি কি করে পৌঁছানো যায় দ্বীপটাতে। এমন সময় শালতি চালিয়ে একজন নিগ্রো ছেলে এগিয়ে এলো আমাদের কাছে।

ছেলেটাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, দ্বীপটাতে তাহলে মানুষ আছে।

আশপাশটা খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম। নীল সমুদ্রের পানি খাঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে বাদামি হয়ে গেছে। বিশাল সব ঢেউ আছড়ে পড়ছে দ্বীপের গায়ে। বিস্তীর্ণ নদী মোহনায় ভাসছে বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি। দূরে সবুজ গভীর জঙ্গল। চারপাশে কেমন যেন থমথমে বিষণ্ণ আর গুমোট। বাতাস এত সঁতসেঁতে, মনে হচ্ছে শরীর ভিজিয়ে দেবে।

পুরো পরিবেশটাই আমার কাছে মনে হলো অশুভ। তবু নামতে হবে ওই দ্বীপটাতে। খাবার পানি না নিলে সেন্ট পল দ্য লোয়ান্দায় পৌঁছুতে পারব না।

আমার একমাত্র সঙ্গী বুড়ো নাবিক প্যাটারসনকে নোঙর ফেলতে বললাম। স্টিমারের গায়ে শালতি ভিড়তেই বড়ো কাঠের একটা পিপে নিয়ে উঠে পড়লাম তাতে। মিনিট দশেক বাদেই ওটা দ্বীপে এসে পৌঁছাল। খাড়া ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতেই চোখে পড়ল আর্মিটেজ অ্যান্ড উইলসন কোম্পানির সাইনবোর্ড। সাদা চুনকাম করা টানা বারান্দাঅলা নিচুঘর। বড়ো বড়ো কাঠের পিপেয় বারান্দাটা ভর্তি। সৈকতজুড়ে সাজানো তালের ডিঙি আর শালতি। ছোট্ট একটা জেটিও রয়েছে। সাদা পোশাক পরা দুজন ইংরেজ এগিয়ে এলেন। দশাসই চেহারার একজন অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। অদ্ভুত ধূসর তাঁর দাড়ি। অন্যজন লম্বা ছিপছিপে, গোমড়ামুখো। ব্যাঙের ছাতা আকৃতির বিরাট টুপিতে মুখের অর্ধেকটাই ঢাকা পড়েছে।

আপনাকে দেখে সত্যিই খুব খুশি হলাম, টুপি পরা ভদ্রলোক আগে কথা বললেন। আমি ওয়ালকার। আর্মিটেজ অ্যান্ড উইলসন কোম্পানির কর্মচারী। আর ইনি এই কোম্পানির ডাক্তার। মিস্টার সেভারাল। ওরকম কোন ইয়ট আমরা বহুদিন চোখেও দেখিনি।

আমি মেলড্রাম, হাসিমুখে বললাম। জাহাজটার মালিক। ওটার নাম গেমকক।

শখের ভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি? ওয়ালকারই জিজ্ঞেস করলেন।

তা বলতে পারেন। প্রজাপতি সংগ্রহ আমার নেশা। সেনেগালের পশ্চিম উপকূল ধরে যাত্রা শুরু করেছি।

জায়গা বাছাই আপনার ঠিকই হয়েছে, মৃদু হেসে বললেন ডাক্তার সেভারাল।

হেসে বললাম, হ্যাঁ, এরই মধ্যে প্রায় চল্লিশটা বাক্স ভরে গেছে। আপনাদের এই দ্বীপে নেমেছি খাবার পানি নিতে। তবে খাবার পানির সঙ্গে যদি নতুন কোন প্রজাপতির খবর পাই...।

অবশ্যই পাবেন। ওগগাওয়াই নদীর মুখে প্রচুর প্রজাপতি আছে। সবে শুটি কেটে বেরিয়েছে ওগুলো। থাকুন না দুচারদিন আমাদের এই দ্বীপে। আপনি যে দয়া করে এখানে এসেছেন তাতে আমরা সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আসলে কি জানেন, গল্প-গুজব করা তো দূরের কথা, সাদা চামড়ার সভ্য মানুষ দেখার ভাগ্যটাও হয় না।

কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে চললাম। জেটিতে শালতি বেঁধে নিগ্রো ছেলেটাও যোগ দিল আমাদের সাথে।

এখানে তাহলে আপনারা খুবই নিঃসঙ্গ? ডাক্তারকে বললাম।

হ্যাঁ। আগে খুবই অসহ্য লাগত। এখন অবশ্য সয়ে গেছে। কাজে ব্যস্ত থাকি সারাদিনই। সন্ধের পরপরই অবসর তো, সময়টা কাটতেই চায় না।

ওই সময়টা তাহলে কি করেন? জিজ্ঞেস করলাম।

সাধারণত দুজনে গল্পগুজব করি কিংবা মদ খাই। ওয়ালকারের আবার রাজনীতিতে দারুণ ঝোঁক। এসবের ওপর লেখাপড়াও করে প্রচুর।

দ্বীপ সম্পর্কেও অনেক কিছু জেনে নিলাম। এখানকার আবহাওয়া সারা বছর প্রায় একই রকম থাকে। দিনে অসম্ভব গরম। রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা। ঝুমঝুমিয়ে বৃষ্টি নামে যখন-তখন। হঠাৎ করে হাড়-কাঁপানো জ্বরে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলে। সিয়েরালিয়েন থেকে উপকূল ধরে যতই সামনে এগিয়েছি, ততই দেখেছি এই জ্বরের প্রকোপ।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই রেডি হয়ে যাবে রাতের খাবার, বললেন ডাক্তার সেভারাল। এ সপ্তাহে খাবার-দাবার তদারকির ভার পড়েছে ওয়ালকারের ওপর। চলুন না, আমরা ততক্ষণে ঘুরে দেখি দ্বীপটা।

ডাক্তারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিমের আকাশ তখনও রাঙা হয়ে আছে। ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাস কাঁপন তুলল সারি সারি পাম গাছের পাতায়। সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। অনবরত কথা বলে চলেছেন ডাক্তার।

এখানে খুবই নিঃসঙ্গ আমরা। তবে জীবনটা একেবারে বৈচিত্রহীন নয়। রোমাঞ্চও আছে যথেষ্ট। অজানা যত রহস্যের মধ্যে বাস করছি বলতে পারেন। ওই যে দূরে গভীর বনটা দেখছেন না? উত্তর-পুব দিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি। ওটা হলো দুচাইলুর বন। গরিলা আছে অনেক। গ্যাবুন, ভালুক আর বনমানুষও আছে। আর এ পাশের এই বন, দক্ষিণ-পুব দিকে দেখালেন তিনি, এই বনের ভেতর দিয়েই বয়ে এসেছে নদীটা। গভীর রহস্য ঢাকা বন। এখন পর্যন্ত কোনো সভ্যমানুষ যেতে পারেনি ওখানে। নদী মোহনাতে যেসব কাঠের গুঁড়ি ভাসতে দেখছেন, ওগুলো এসেছে ওই বন থেকেই। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপর আমার একটু পড়াশোনা আছে–মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুদ ধরনের অর্কিড গাছপালা ভেসে আসে, যার কোনো নাম নিশানাই আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বইয়ে দেখিনি। সভ্য মানুষের কাছে যা কল্পনারও অতীত। বলতে বলতে রহস্যঘন হয়ে ওঠে ডা. সেভারালের চোখ আর কণ্ঠস্বর। ফিসফিস করে বললেন, অজানা ওই বনটাই টিকিয়ে রেখেছে আমাদের ব্যবসা। ভেসে আসা ওই বনের শক্ত খুঁড়ি দিয়েই পিপে তৈরি করি আমরা।

কী গাছ ওগুলো? জিজ্ঞেস করলাম।

অনেক রকমের গাছ আছে। সেগুনই বেশি। এই যে এসে গেছি।

তাকাতেই দেখি সামনে সাদা ঘরটা। কথা বলতে বলতে কখন যে ফিরে এসেছি লক্ষ্যই করিনি।

এটাই আমাদের পিপে তৈরির কারখানা, একটু ইতস্তত করে রহস্যময় কণ্ঠে বললেন তিনি। আচ্ছা এই ঘরটা দেখে কি কিছু মনে হচ্ছে আপনার? এই, মানে–অশুভ কিছু?

ঝট করে ঘরটার দিকে তাকালাম। সাদা রঙ করা কাঠের বেড়া। উঁচু টিনের চালা আর মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা মেঝে। ঘরের এক কোণে মেঝেতে মাদুর পেতে কম্বল বিছিয়ে বিছানা করা। পাশে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার ছাড়া পুরো ঘরটাই খালি। বললাম, কই নাতো। তেমন কিছু তো মনে হচ্ছে না।

হ্যাঁ, আর দশটা ঘরের মতো খুবই সাধারণ দেখতে এই ঘরটা; কিন্তু তবু অসাধারণ। আজ আমি একা এই ঘরে থাকব। ওই বিছানায় ঘুমাব। ভাবতেই ভয় লাগছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভীতু নই।

এমন করে বলছেন কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুদিন ধরে এখানটাতে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে। আপনি ভেবেছেন এখানকার জীবন একঘেয়ে। কিছুদিন দ্বীপটায় কাটালেই বুঝতে পারবেন, উত্তেজনা আর রহস্যের কোন অন্ত নেই এখানে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে আজব কুয়াশায় ঢেকে যায় পুরো দ্বীপ। এখানকার লোকে একে বলে জ্বর কুয়াশা। নদীর ওপারের জলাটা দেখুন।

ছোটো ছোটো ঘন ঝোঁপ-ঝাড় থেকে উঠে আসছে চাপ চাপ বাস্প; চওড়া নদী পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, দ্বীপের দিকে। বাতাস অনেক বেশি ঠান্ডা আর স্যাঁতসেঁতে।

চলুন, রাতের খাবারের ঘণ্টা পড়েছে। আর হ্যাঁ, এই ঘরটা সম্পর্কে আগ্রহ থাকলে পরে নাহয় শুনবেন।

আগ্রহ বলছেন কী? আমি তো শোনার জন্য রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠেছি।

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন তিনি। খালি ঘরটার দিকে ওঁর মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকা, রাত কাটানোর কথাতে তাঁর ভয় আর সতর্কতার অভিব্যক্তি আমাকে প্রচণ্ড আগ্রহী করে তুলেছে।

কিছু মনে না করলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম, বললাম আমি।

বলুন না।

শ্রমিকদের থাকার যে কুঁড়েঘরগুলো দেখালেন, সেখানে যে কাউকে দেখলাম না?

ওরা রাতে ঘুমানোর জন্য ওই জাহাজটায় চলে গেছে।

তাকিয়ে দেখি নদীর পারের খাড়িতে একটা ভাঙা জাহাজ পড়ে রয়েছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওই ভাঙা জাহাজে থাকে? কেন? তাহলে ওদের থাকার জন্য এই কুঁড়েগুলো বানানোর দরকার কি ছিল?

কয়েকদিন আগেও ওরা এখানেই থাকত। প্রাণের ভয়ে এখন আর থাকে না। রাতে এই দ্বীপে এখন ওয়ালকার আর আমি ছাড়া কেউ থাকে না।

কিসের ভয়?

চলুন খেতে যাই। খাওয়া-দাওয়ার পর সবই বলব আপনাকে।

খাবার আয়োজনটা বেশ যত্ন সহকারেই করা হয়েছে। বন তিতিরের ঝাল মাংস আর লাল আলুর চাটনি। বেশ সুস্বাদু। খাবার পরিবেশন করল সিয়েরালিয়েনের একটি ছেলে। এ ছেলেটি ভয়ে আর সবার মতো পালায়নি দেখে অবাকই হলাম। খাওয়া শেষ হলো।

মদ ঢেলে দিল সে। তারপর নিজের মাথার পাগড়িটা ঠিক করে বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনাদের কি আর কিছু লাগবে?

না মাউসা, আমাদের আর কিছুই লাগবে না, বললেন ওয়ালকার। আমার শরীরটা ভালো না। আজ রাতটা কি তুমি আমার কাছে থাকবে?

মুহূর্তে ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ছেলেটির মুখ। না-না, স্যার! আমাকে মাপ করুন। ককিয়ে উঠল সে। আপনি বরং আমাদের জাহাজটাতে চলুন। সারারাত জেগে আপনার আমি সেবা করব।

ঠিক আছে, তুমি যাও। আর শোন, ভয় পেয়ে কর্তব্যে অবহেলা কোনো ইংরেজ করে না।

আজকে আমাকে মাপ করবেন, স্যার। গতকাল কিংবা আগামীকাল হলেও নাহয় কিছু একটা করতাম। কিন্তু আজ যে তৃতীয় দিন। আজ আমি কোন কিছুর বিনিময়েই এই দ্বীপে থাকতে পারব না।

কাঁধ ঝাঁকালেন ওয়ালকার। তুমি না থাকলে তো আর আমরা জোর করতে পারি না। তুমি রেডি থেকো, ফাস্ট মেল-বোট এলেই তোমাকে সিয়েরালিয়েনে চলে যেতে হবে। বিপদের সময় যাকে দিয়ে সামান্যতম উপকার হয় না, তেমন কর্মচারীর দরকার নেই আমাদের।

চাকরি যাওয়ার ভয় দেখিয়েও কোনো লাভ হলো না। কিছুতেই রাজি হলো না সে।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত দেখলেন তো? আপনিই নিশ্চয়ই ডাক্তারের কাছ থেকে সব কিছু শুনেছেন?

না, ওয়ালকার। ওঁকে এখনও কিছুই বলিনি, বললেন ডাক্তার। পিপে তৈরির কারখানাটা শুধু দেখিয়েছি। কিন্তু তোমাকে দেখে তো মোটেও সুস্থ মনে হচ্ছে না। আবার জাঁকিয়ে জ্বর আসছে নাকি হে?

হ্যাঁ। সারাটা দিনই কেমন খারাপ লেগেছে। এখন মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে যেন হাজারটা কামানের গোলা ফাটছে। প্রায় দশ গ্রাম কুইনিন খেয়েছি। কানের মধ্যেও ভোঁ ভোঁ করছে, ম্লান হেসে বললেন তিনি। তুমি চিন্তা কোরো না। অসুস্থ হলেও তোমার সঙ্গে কারখানায় থাকব আমি।

না-না, ওয়ালকার, বাধা দিলেন ডাক্তার। খারাপ শরীর নিয়ে তোমাকে ওখানে ঘুমোতে যেতে হবে না। তুমি বরং এখনই তোমার বিছানায় শুয়ে পড়। আমি একাই থাকব কারখানায়।

মি, ওয়ালকারের ফোলা ফোলা মুখ, টকটকে লাল চোখ আর অতিরিক্ত কাঁপুনিতে দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে দেখে বুঝলাম, এই সেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের ম্যালেরিয়া। যা অতর্কিত হামলা চালিয়ে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলে।

ডাক্তার আর আমি ওয়ালকারকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। একটা কড়া ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে দিলেন ডাক্তার, যাতে রাতে ঘুম ভেঙে কষ্ট না পান।

চলুন, ক্যাপ্টেন, আমরা খাবার ঘরে বসে আরেকটু কথা-টথা বলি।

গ্লাসে নতুন করে মদ ঢেলে মুখোমুখি বসলাম আমরা।

সারা বছরই আমাদের দুজনের এই একলা পালা চলে আসছে, বললেন ডাক্তার। ওর শেষ হলেই ধরবে আমাকে। তবে ভাগ্য ভালো যে এক সঙ্গে দুজনে কখনও পড়িনি। আজ রাতে বেচারাকে একাই থাকতে হবে। খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই, আজ ভয়ঙ্কর এক রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে। ওই কারখানাঘরে বসে রাত জেগে পাহারা দেব। আজ আমাকে জানতেই হবে, কুলিদের মনে কেন এত ভয়? কেন তারা সূর্য ডোবার সাথে সাথে দ্বীপ ছেড়ে পালায়।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি শুনতে থাকলাম ডাক্তারের কথা। তিনি বললেন, পিপেটিপে যাতে চুরি না হয়, তাই কারখানা পাহারা দেয়া হয়। আজ থেকে ছয় দিন আগে একজন আফ্রিকান রাতে পাহারায় ছিল। সকালে আর তার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল। কোন শালতি কিংবা ডিঙিও খোয়া যায়নি যে ভাবব সে পালিয়েছে। আর পালানোর চেষ্টা করা তো আত্মহত্যার সামিল। কারণ কুমিরে গিজগিজ করছে নদী। জলজ্যান্ত মানুষটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এ-ঘটনার ঠিক তিন দিন পর অর্থাৎ আজ থেকে তিনদিন আগে আবারও একজন গার্ড গায়েব হয়ে গেল। সেই একই অবস্থা। কোন পাত্তা নেই। ওয়ালকার আর আমি এই ঘটনাটা যেভাবেই দেখি না কেন, স্থানীয় কর্মচারীরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। ওদের ধারণা, এটা কোন ভূতুড়ে ব্যাপার।

তা কী করে সম্ভব? বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

সেটাই তো রহস্য। কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। সবারই বিশ্বাস, দৈত্য-দানবের কাজ। তিনদিন পরপর তার জ্যান্ত মানুষ প্রয়োজন। এটা মাথায় ঢোকার পর থেকে আর কোনমতেই ওরা দ্বীপে থাকতে রাজি নয়। এই মাউসা ছেলেটার কথাই ধরুন, খুবই বিশ্বাসী আর অনুগত। দেখলেনই তো, সেও কোনমতেই রাজি হলো না। ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হয়ে উঠেছে। এ রহস্যের সমাধান তাই করতেই হবে আমাকে। আজকে এসেছে সুযোগ। আরেকটা তৃতীয় রাত। নিজেই আজ টোপ হতে যাচ্ছি। তাছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না।

কোনো সূত্রও কি পাননি? যেমন–ধস্তাধস্তি, পায়ের দাগ অথবা রক্ত টক্ত?

নাহ! কিছু পাইনি।

আশ্চর্য! যা বুঝলাম, আপনার একার জন্য খুব কঠিন হবে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি!

সত্যি করবেন? উফ্, বাঁচালেন! ডাক্তার যেন পরম স্বস্তি পেলেন।

যাই, জাহাজে গিয়ে জানিয়ে আসি, আজ রাতে আমি দ্বীপেই থাকব।

চলুন, আমিও আপনার সাথে যাই।

ফেরার পথেই পশ্চিম আকাশে ঘনিয়ে এল ঘন কালো মেঘ। এলোমলো ঝড়ো হাওয়া শুরু হলো। প্রচণ্ড গর্জনে ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল সৈকতে। থেকে থেকে গরম বাতাসের ঝাঁপটা মারতে লাগল মুখে।

ঝড়ের গতি দেখে তো ভালো মনে হচ্ছে না, বিড়বিড় করে বললেন ডাক্তার।

কেন? অবাক হলাম আমি।

যে গরম বাতাস, বোঝাই যাচ্ছে নদীর ওপারের জঙ্গলে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ওই বৃষ্টির পানিতে ঢল নামবে নদীতে। তার ওপর আসছে জোয়ার। এমন পরিস্থিতিতে সমুদ্র যেভাবে ফুঁসে ওঠে, মনে হয়, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি দ্বীপটা।

কারখানায় যাওয়ার আগে ওয়ালকারকে দেখে আসি।

গাঢ় ঘুমে মরার মতো পড়ে আছে ওয়ালকার। তার খাটের পাশের টেবিলে এক গ্লাস লেবুর শরবত করে রাখলেন ডাক্তার। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে কারখানার পথ ধরলাম। কারখানায় পৌঁছে লণ্ঠন জ্বাললেন ডাক্তার। তারপর সলজ্জ হেসে বললেন, বই, তামাক সবই আছে। খুব একটা অসুবিধে হবে না।

লণ্ঠনের আলোয় এতবড় ঘরটা আলোকিত হলো না, বরং কেমন যেন বিষণ্ণ আর ম্লান মনে হলো। পাশাপাশি চেয়ার পেতে রাত জাগার জন্যে প্রস্তুত হলাম আমরা। আমার জন্য একটা রিভলভার আর নিজের জন্য একটা শক্তিশালী দোনালা বন্দুক বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন ডাক্তার। যাতে দরকার পড়লেই দ্রুত ব্যবহার করা যায় ওগুলো।

দেয়ালে কালো বড়ো বড়ো দুই ছায়া পড়েছে আমাদের দুজনের। হালকা আলোয় ভৌতিক মনে হচ্ছে। আলো এত কম! শিরশির করে উঠল গা। ডাক্তারও বোধহয় ভয়

পাচ্ছিলেন, তাই উঠে গিয়ে আরো দুটি মোমবাতি জ্বাললেন। আমার চেয়ে তিনি অনেক বেশি সাহসী। কোনো সন্দেহ নেই। তবু তার মধ্যে অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম। একটা বই খুলে পড়তে বসলেন। কিন্তু এক পাতাও পড়তে পারলেন না। অস্থিরভাবে তিনি বারবার তাকাতে লাগলেন এদিন-সেদিক। কাঠ হয়ে বসে আছি। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা যেন দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে আছে আমার বুকের ওপর। অশুভ রহস্যটা কল্পনার নানান রঙে রাঙিয়ে ভীত-বিহ্বল করে তুলল আমাকে। যেন মৃত্যুদূতের প্রতীক্ষায় অনন্তকাল বসে আছি দুজনে। কেমন তার চেহারা, কীভাবে সে আসবে কিছুই জানি না। শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা।

ডাক্তারকে দুঃসাহসী মনে হলো। কী সাংঘাতিক! তিনি একাই থাকতে চেয়েছিলেন এই ঘরে! ওরে বাপরে, পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়েও এই ঘরে আমি একা রাত কাটাতে রাজি হতাম না।

অনন্ত যেন এই ভয়াবহ রাত। পানির স্রোতের ক্রুদ্ধ গর্জন। খ্যাপা হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ। ঝপাৎ ঝপাৎ করে ভেঙে পড়ছে মাটির চাই। একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে ঝিঁঝি পোকা। এত বিকট শব্দের মাঝে বসে আছি তবু মনে হচ্ছে নিদারুণ নিস্তব্ধ সব। হঠাৎ ডাক্তারের হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল বইটা। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ যেন থেমে গেল। সমস্ত রক্তস্রোত ছলকে উঠল বুকের মধ্যে।

চেয়ারে বসা থেকে ঝটু করে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রইলেন জানলার দিকে।

কি-ক্কি হয়েছে? ওদিকে কী দেখছেন? এইটুকু কোনোমতে বলতে পারলাম।

আপনি কি কিছুই দেখতে পাননি? উল্টে আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

কই, নাতো। কিছুই দেখিনি। আপনি দেখেছেন? কি দেখেছেন?

স্পষ্ট কিছু দেখিনি। মনে হলো বাইরে কিছু একটা দ্রুত সরে গেল।

দোনলা বন্দুকটা তাক করে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। আশপাশটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, কই, কিছুই তো দেখছি না!

হয়তো গাছের পাতা-টাতা নড়তে দেখেছেন। বাইরে যা ঝড়ের দাপট, এ অবস্থায় ভূতেরাও বেরুতে সাহস পাবে না। মোট পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম আমি।

তা হতে পারে, বলে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মেঝে থেকে বইটা তুলে নিয়ে ফের পড়াতে মন দিতে চাইলেন। তা আর হলো না। থেকে থেকে অকারণেই তাঁর দৃষ্টি চলে যাচ্ছে জানালার দিকে। আমিও তাকিয়ে আছি ওদিকেই।

প্রকৃতির তাণ্ডব আরও বেড়ে গেল। ঝড়ের প্রচণ্ড গতি দেখে মনে হলো, উড়িয়ে নিয়ে যাবে বুঝি এই ঘরটাও। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেই সঙ্গে মেঘের গর্জন। কান ফাটানো শব্দে আশেপাশে কোথাও বাজ পড়ল। বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে ঝলসে গেল চোখ। পরমুহূর্তে শুরু হলো বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি। সমানে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়ের প্রলয়ংকর তান্ডব চলল কয়েক ঘণ্টা ধরে।

ঈশ্বর, দ্বীপটা বুঝি ভেসেই গেল এবার, আপন মনেই বললেন ডাক্তার। এমন বৃষ্টি হতে কোনদিন দেখিনি। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অভিশপ্ত তৃতীয় রাতটা তো কেটে গেছে। ক্যাপ্টেন, দেখুন ভোর হয়ে গেছে। উচছুসিতভাবে বললেন তিনি, যাক, বোকা লোকগুলোকে তো বলতে পারব, দেখ বেঁচে আছি আমরা!

বাইরে তাকালাম। সত্যি সকাল হয়ে গেছে। থেমে গেছে বৃষ্টি। পরিষ্কার আকাশ। কলকল শব্দে গড়িয়ে চলেছে বৃষ্টির পানি। নদীতে গিয়ে পড়বে।

এতক্ষণ পর মনে পড়ল গেমককের কথা। সারারাত ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় একটুও মনে পড়েনি ওটার কথা। এই বৃষ্টিতে ভেসে যায়নি তো জাহাজটা!

আমার শুকনো মুখ দেখে তিনি বললেন, কফি খাওয়া যাক। যা ধকল গেছে রাতভর।

কারখানা ছেড়ে খাবার ঘরে এসে ডাক্তার বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ওয়ালকারকে দেখে আসি।

ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলাম কফি বানানোর জন্যে। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন তিনি। ধপ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। দেখি তার চোখের কোণে চকচক করছে পানি।

কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

ডুকরে উঠলেন ডাক্তার, ও আর নেই!

ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। কী বলছেন আপনি? মি. ওয়ালকার মারা গেছেন?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। হ্যাঁ। মারা গেছে ওয়ালকার।

ডাক্তারকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে ঢুকলাম শোবার ঘরে। আবছা অন্ধকার। বিছানায় শুয়ে রয়েছেন ওয়ালকার। মনে হচ্ছে যেন ঘুমাচ্ছেন।

সত্যি মারা গেছেন! বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি।

কয়েক ঘণ্টা আগেই, শুকনো খসখসে কণ্ঠস্বর তার।

কিসে? জ্বরে?

না।

তাহলে?

ওর বুকে চাপ দিয়ে দেখুন?

বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দ্বিধা করলাম একবার। মি. ওয়ালকারের বুকে হাত রেখে আলতো চাপ দিলাম। চমকে গেলাম। একি! তুলতুলে নরম! যেন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একটা পুতুল!

ব্যাপার কী? অবাক হলে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

চুপ করে রইলেন তিনি।

কি, কিছু বুঝতে পেরেছেন?

ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার। বোধহয় পারছি। আসুন আমার সঙ্গে, বলে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

দরজার বাইরে বেরিয়ে মাটির দিকে তাকালেন। মোটেও খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। হাত তুলে দেখালেন তিনি। দরজার কাছ থেকে চলে গেছে মোটা একটা দাগ। যেন অনেক মোটা দমকলের পাইপ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভেজা নরম মাটির ওপর দিয়ে।

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কিসের দাগ?

আমার কথা যেন কানেই যায়নি ডাক্তারের। তাকিয়ে রয়েছেন বনের দিকে। দাগটা সেদিকেই চলে গেছে। জ্বলে উঠল তার চোখ। আমার দিকে ফিরে বললেন, এক মিনিট, আসছি। বলে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বেরিয়ে এলেন হাতে বন্দুক নিয়ে। বললেন, আসুন।

নীরবে তার সঙ্গে রওনা হলাম। দাগটা অনুসরণ করে চললেন তিনি। এঁকে বেঁকে চলে গেছে চিহ্ন। অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হলো না।

বেশি দূর যেতেও হলো না। বনের ভেতর শখানেক গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার। গাছপালা এখানে বেশ ঘন আর বড়ো বড়ো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে এবার শুধু চোখ দিয়ে খুঁজতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বললেন, ওই দেখুন।

দেখলাম। ধক করে উঠল বুক। মোটা একটা ডালে জড়িয়ে রয়েছে। বিশাল কালো চকচকে একটা শরীর। মাথাটা বিরাট। গলার কাছটা ধূসর। ভয়ঙ্কর কুতকুতে দুটো চোখ। এত বড়ো সাপ আমি জীবনে দেখিনি।

আমাদের দেখেই পাক খুলতে শুরু করল সাপটা। মাথাটা ঝুলে পড়তে লাগল নিচের দিকে। শিকার দেখতে পেয়েছে। পুরোপুরি মানুষখেকো হয়ে গেছে ওটা।

দেরি করলেন না ডাক্তার। সোজা মাথাটা সই করে ট্রিগার টিপে দিলেন। ঝটকা দিয়ে দোলনার মতো দুলে উঠল একবার মাথাটা। তারপর পেন্ডুলামের মতো দুলতে লাগল এপাশ ওপাশ। মৃত্যুযন্ত্রণায় মোচড় খেতে গিয়ে আপনাআপনি খুলে গেল পাক। তারপর ঝুপ করে পড়ল মাটিতে।

মরতে এত দেরি করছে কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

মরে গেছে। তবে আরও অনেকক্ষণ এরকম করবে। সাপ এমনই করে।

এটাই তাহলে সেই অশরীরী দানব? যার ভয়ে কাতর হয়ে আছে আদিবাসীরা?

হ্যাঁ। এবং ওয়ালকারের হত্যাকারী। তাঁকে পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে।

নিয়ে গেল না কেন তাহলে?

এসেছিল নেয়ার জন্যেই। শুরুতে কারখানায় উঁকি দিয়েছিল। আলো দেখে আর ঢোকেনি। ঢুকেছিল ওয়ালকারের ঘরে, মেরেও ছিল তাকে। কিন্তু গেলার আগেই কোনো কারণে ঘাবড়ে গিয়ে পালায়। সম্ভবত বাজ পড়ার শব্দেই।

এই যে তৃতীয় রাত তৃতীয় রাত করলেন, ব্যাপারটা কি? ভূতপ্রেত তো আর নয়, ঠিক তিনদিন পর পর নিয়ম করে আসত কেন?

সহজ ব্যাখ্যা। তিন দিনে হজম হয়ে যেত মানুষটা, যাকে শিকার করে নিয়ে যেত। খিদে লাগত, তখন আবার আসত নতুন শিকারের সন্ধানে।

তার মানে এলাকাটা এখন বিপদমুক্ত? সাপটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এখনও নড়ছে ওটা। আরও তো সাপ থাকতে পারে?

না। এখানে এরকম সাপ নেই। ওটা এসেছে ওই ওদিক থেকে। বড়ো বড়ো দ্বীপ আছে, তাতে গভীর জঙ্গল। ওসব জায়গায় এরকম সাপ আছে বলে শুনেছি। নিশ্চয়ই খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে কোন এক দ্বীপে। খোঁজ করতে করতে শেষে আটলান্টিক পেরিয়ে চলে এসেছিল এটা এখানে। চলুন, এক কাপ চায়ের এখন বড়ো দরকার। আর লোকজনকে ডেকে বলতে হবে, বিপদ কেটে গেছে। এবার নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে ওরা। ইস, কি আতঙ্কই না ছড়িয়ে রেখেছিল শয়তানটা এতদিন!

# নাইটগার্ড

মধ্য জুলাইয়ের এক রাত। বেশ গরম পড়েছে। স্থির হয়ে আছে বাতাস। পরিষ্কার আকাশে নির্মল চাঁদ। তরুণ পুলিশ কনস্টেবল মিটফোর্ড নির্জন রাস্তায় কেবল নিজের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। এ ছাড়া চুপচাপ রেনার স্ট্রিট। কোনো বাড়ির জানালায় আলো জ্বলছে না। বাসিন্দারা সবাই অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

তরুণ কনস্টেবল তার ঘড়ি দেখল। রাত আড়াইটা। নিজেকে হঠাৎ সুখী সুখী লাগল তার। খুব বেশিদিন হয়নি সে পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েছে। আর রাস্তায় টহল দেয়া এবারই প্রথম। এর আগে অবশ্য এক বয়সী পুলিশম্যান তার সঙ্গে ডিউটি করেছে। এখন পি.সি.মিটফোর্ডকে একাকী টহল দিতে পাঠানো হয়েছে। যাক, অবশেষে সে সত্যিকারের পুলিশম্যান হতে পারল।

রাত বাজে দুটো ত্রিশ। তিনটার সময় তার থানায় গিয়ে রিপোর্ট করার কথা। এরপরে মিটফোর্ডের ডিউটি শেষ। সে বাড়ি যেতে পারবে। সত্যিকারের পুলিশম্যানের ভূমিকায় তার কাজ শেষ হতে চলেছে আধঘণ্টার মধ্যে।

ধীরে ধীরে হাঁটছে মিটফোর্ড, সতর্ক নজর বুলাচ্ছে রাস্তায়। নিজের চোখজোড়া ব্যবহার করার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাকে। একজন ভালো পুলিশম্যান, সবসময় চোখ কান খোেলা রাখে। তারা শিখিয়েছে ওকে। পি.সি. মিটফোর্ড একজন ভালো পুলিশম্যান হতে

চায়। আজ রাতে কোনোকিছুই তার সতর্ক নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না। ২৬ নং বাড়ির নিচতলার জানালা দেখা যাচ্ছে খোলা। ২১ নং বাড়ির সদর দরজার বাইরে বাগান করার কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে।

যত্তসব কেয়ারলেস মানুষজন! আপন মনে বলল পি.সি. মিটফোর্ড। ভাবে নির্জন রাস্তা বলে নিরাপদেই আছে। তারা চিন্তাই করছে না যে রেনার স্ট্রীটে চুরি ডাকাতি হতে পারে।

একটা মস্ত কালো বিড়াল রাস্তা পার হয়ে ১৩ নং বাড়ির দেয়ালে উঠে পড়ল লাফ মেরে। তারপর দোরগোড়ায় বসে মিটফোর্ডকে টহল দিতে দেখল। পি.সি. মিটফোর্ড মৃদু হাসল। তুমি বাড়ি চলে এসেছ, তাই না? বলল সে। আমিও শিগগির বাড়ি ফিরব। বিদায়, বিড়াল!

মনটা ভারি খুশি লাগছে মিটফোর্ডের। তার রাতের পাহারা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তার মোড়ে এসেছে সে, দেখল ৩ নং বাড়ির বাইরে বিরাট একটি সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির নম্বর টুক নিল মিটফোর্ড-44B777X। গাড়ির দরজা বন্ধ এবং ঠিকঠাক জায়গাতেই পার্ক করেছে।

গুড, মনে মনে বলল সে, অন্তত একজন সাবধানী মানুষ বাস করেন রেনার স্ট্রিটে।

সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল ৩ নম্বর বাড়িটির দিকে। বেশ বড়ো বাড়ি তবে বাগানের যত্ন নেয়া হয় না বলে আগাছা জন্মেছে এবং দরজায় রঙ লাগানোও দরকার।

আশ্চর্য! ভাবছে মিটফোর্ড। দেখে তো এটাকে বড়ো লোকের বাড়ি বলেই মনে হয়। অথচ ঘরদোর-বাগান এমন অবহেলায় ফেলে রেখেছে কেন মালিক?

মিটফোর্ড হাঁটছে লাগল। ৩নং বাড়ি পার হয়ে কিছুদূর এগিয়েছে, একটা শব্দ শুনতে পেল পেছনে। পাঁই করে ঘুরল সে। বাড়িটির সদর দরজা খোলা। এক লোক বাগানের রাস্তা ধরে গাড়িটির দিকে ছুটে যাচ্ছে। লোকটা বেশ লম্বা, পরনে কালো সুট, হাতে একটা কেস। তার চেহারা চকের মতো সাদা। দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। চোখজোড়া বিস্ফোরিত এবং কেমন উদ্ভ্রান্ত চাহনি। মুখের তুলনায় চোখ দুটো ড্যাবড়েবে।

এক মুহূর্তের জন্য সে বড়ো গাড়িটির পাশে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল।

কনস্টেবল দৌড়াল তার পেছন পেছন। থামুন! বলল সে। থামুন! কে আপনি? আপনি কি এখানে থাকেন?

লোকটি কোনো জবাব দিল না। মিটফোর্ড ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। জানে লোকটা ওর সঙ্গে দৌড়ে পারবে না।

কিন্তু রেনার স্ট্রিটের মাথায় এসে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। এক মুহূর্ত আগেও সে ওখানে ছিল। তরুণ কনস্টেবলের কয়েক হাত দূরে। পরের মুহূর্তে সে নেই হয়ে গেল। চাঁদের ঝলমলে আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায় জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই।

৩ নং বাড়িটির দিকে ফিরে তাকাল মিটফোর্ড। গাড়িটি এখনও ওখানে আছে। বাগানে গাছ-গাছালির ছায়া বাড়ির সদর দরজা খোলা।

মিটফোর্ড জানে তার করণীয় কী। বাড়ির ভেতরে ঢুকবে সে। ৩ নং বাড়িতে নিশ্চয়ই অদ্ভুত কিছু ঘটেছে। হঠাৎ ওর ভয় লাগল। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে সায় দিচ্ছে না মন। গভীর দম নিল সে। পা বাড়াল বাগান পথে। কর্তব্য পালন তাকে করতেই হবে।

সদর দরজার পরেই বড় একটা হলঘর। পুলিসি টর্চের জোরালো আলো ফেলল মিটফোর্ড হলঘরে। কয়েকখানা চেয়ার টেবিল দেখতে পেল। ধুলো পড়া। বিদ্যুত্বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করল সে। জ্বলল না। ইলেকট্রিকের লাইন কাটা।

কেউ এখানে থাকে না, ভাবল মিটফোর্ড। অনেক দিন ধরেই কেউ এখানে বাস করে না।

তখন সে একটা শব্দ শুনতে পেল। বাড়ির ভেতরে কোথাও কাঁদছে এক মহিলা। শ্বাস চেপে রেখে কান্নার আওয়াজ শুনল মিটফোর্ড। কান্নার রোল ওপরে উঠছে এবং নামছে তবে থামছে না। দোতলার একটা ঘর থেকে আসছে কান্নার শব্দ।

হলঘরের চারপাশে আবারও টর্চের আলো বুলাল মিটফোর্ড। হলঘরের শেষপ্রান্তে সিঁড়ি। মন্থর গতিতে ওদিকে এগোল সে। বাইতে লাগল সিঁড়ি। ধাপগুলোয় ধুলো মাখা

ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে। ওর জুতোর ছাপ পরিষ্কার পড়তে লাগল ধুলোর গায়ে। পেছন ফিরে হলঘর দেখল মিটফোর্ড। টর্চ মারল মেঝেয়। ওখানেও তার জুতোর ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে। ধুলোমাখা মেঝেয় শুধু ওর পায়ের ছাপ।

একটা কথা মনে পড়তেই মিটফোর্ডের কলজেটা তড়াক করে লাফ মারল। ওই লোকটা, ভাবছে সে, ওই লোকটা কয়েক মিনিট আগে এ বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়েছিল

তার পায়ের ছাপ পড়ল না হলঘরের মেঝেতে? ধুলোয় কেন শুধু আমার পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি?

ফিরে যেতে মনস্থ করল মিটফোর্ড। মনে মনে বলল, বাইরে থেকেও বাড়ির ওপর নজর রাখতে পারব আমি। রেডিও ব্যবহার করে যোগাযোগ করব থানার সঙ্গে। ডিউটি অফিসারের কাছে সাহায্য চাইব। সাহায্য না আসা পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটির দিকে নজর রাখতে পারব। সার্জেন্ট টমাস বুঝতে পারবেন যে আমার সাহায্যের দরকার। আমি কী দেখেছি, তা তাকে রিপোর্ট করব। ছুটে পালানো অদ্ভুত লোকটার ব্যাপারে বলব তাকে। বলব ৩ নং বাড়ির সদর দরজা খোলা। বলব আমার মনে হলো এ বাড়িতে আরও কেউ আছে। আমি–

তবে সে চলে যেতে পারল না। মহিলার কান্না হঠাই থেমে গেছে। দোতলার বেডরুম থেকে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার ভেসে এল।

না! না! প্লিজ, না! জোনাথন, প্লিজ ডোন্ট! প্লিজ... প্লিজ!

ভয়ানক চিৎকারটার জায়গা দখল করল এক বিকট আর্তনাদ, আআআ!

পি.সি. মিটফোর্ড ভালোই ট্রেনিং পেয়েছে। সার্জেন্ট টমাস তাকে ভালো ট্রেনিং দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন বিপদ দেখলে কোনো পুলিশম্যানের উচিত নয় সেখান থেকে ছুটে পালানো। মিটফোর্ড জানে তার করণীয় কী। বিকট চিৎকারটি ছিল সাহায্যের জন্য আকুল আর্তনাদ।

কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকাল কনস্টেবল। বেডরুমের দরজা বন্ধ। সে জোরে লাথি কষাল দরজায়। একবার...দুইবার... তিনবার। ঝড়াং করে খুলে গেল কপাট।

বেগে ভেতরে ঢুকল মিটফোর্ড। কামরার সর্বত্র দ্রুত বুলাল টর্চের আলো। একটি খালি চেয়ার একটি ড্রেসিং টেবিল

উল্টানো একটি বেডসাইড টেবিল এবং একটি বিছানা চোখে পড়ল। বিছানায় স্তূপ হয়ে আছে বেডক্লথ। মিটফোর্ড ধীরপায়ে হেঁটে গেল ওদিকে। হয়তো কেউ ভারী বেডকুথের স্তূপের নিচে ঘাপটি মেরে আছে।

ডান হাত থেকে বাম হাতে টর্চ নিল মিটফোর্ড। বিছানার ওপর ফেলে রাখল আলো। তারপর বেডক্লথগুলো টান মেরে সরিয়ে ফেলল।

এক মহিলার লাশ তাকিয়ে আছে মিটফোর্ডের দিকে। মহিলার খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আছে কালো কুচকুচে জিভ। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে। মহিলার হলুদ রঙের চামড়া থেকে বিশ্রী, গা গোলানো একটা গন্ধ আসছে।

মাই গড! চেঁচিয়ে উঠল মিটফোর্ড। আমার প্রথম রাতের পেট্রলের দিনেই হত্যাকাণ্ড। আর আমি কিনা খুনিকে পাকড়াও করতে গিয়েও ব্যর্থ হলাম!

বেডক্লথ দিয়ে বীভৎস চেহারার মরা মুখটা ঢেকে দিল সে। বেডরুমের দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মিটফোর্ড। ৩ নম্বর বাড়ির বাইরে এসে রেডিওতে ডিউটি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

পি.সি. মিটফোর্ড বলছি, সার্জেন্ট। আমি রেনার স্ট্রিটে ৩ নং বাড়ির সামনে রয়েছি। এখানে একটি মার্ডার হয়েছে। আমি নিশ্চিত এটি একটি হত্যাকাণ্ড। আমি খুনিকে দেখেছি তবে ধরতে পারিনি। সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা। ষাটের কাছাকাছি বয়স। পরনে ছিল কালো সুট। হাতে ছোটো একটি ডাক্তারি ব্যাগ। মৃতজন একজন মহিলা। সে–

সার্জেন্ট টমাস ওকে বাধা দিলেন। এখুনি থানায় রিপোর্ট করো, মিটফোর্ড। তোমার পেট্রল রাত তিনটায় শেষ হওয়ার কথা। এখন প্রায় তিনটা বাজে।

কিন্তু, সার্জেন্ট, এ বাড়িতে একজন মৃত মহিলা পড়ে আছেন আর খুনি পালিয়ে যাচ্ছে। আমার দরকার–

কথার মধ্যে কথা বোলো না, মিটফোর্ড। যা করতে বললাম করো। ৩ নম্বর বাড়ির দরজা বন্ধ করো। তারপর এখানে এসে রিপোর্ট করো। তোমার মেসেজ আমরা পেলাম এবং গ্রহণ করলাম।

রেডিওর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সার্জেন্ট টমাসের কথা শেষ হতেই। পি.সি. মিটফোর্ড ৩ নম্বর বাড়ির দরজা বন্ধ করল। তালা লাগাল। তারপর পরীক্ষা করে দেখল ঠিকঠাক লেগেছে কিনা। নাহ, ঠিক আছে। তারপর অস্থির চিত্তে সে পা বাড়াল থানায়।

.

বসো, মিটফোর্ড। নাও, চা খাও, টেবিলের ওপর দিয়ে চায়ের কাপ কনস্টেবলের দিকে ঠেলে দিলেন সার্জেন্ট টমাস। এখন তুমি আমাকে বললো কী ঘটেছে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি তোমাকে বাধা দেব না।

তিনি চুপচাপ শুনে গেলেন কনস্টেবলের গল্প। তারপর বললেন, ঠিক আছে। এখন কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও। সবার আগে বলো আজ কতারিখ?

১৩ জুলাই, সার্জেন্ট। কিন্তু কেন–?

স্রেফ আমার প্রশ্নের জবাব দাও, মিটফোর্ড। আজ রাতে অনেক কিছু ঘটেছে যা তুমি বুঝতে পারেনি। অনেক কিছু আমারও বোধগম্যের বাইরে। তবে তোমার চেয়ে কিছু জিনিস আমি বেশি জানি।

কিন্তু ওই লোকটা, সার্জেন্ট। আমি রেনার স্ট্রিট ধরে লোকটাকে পালিয়ে যেতে দেখেছি। আমাদের পুলিশ কার নিয়ে ওর খোঁজ নেয়া উচিত।

পুলিশ ওর খোঁজ পাবে না, মিটফোর্ড। কেউই ওর সন্ধান পাবে না।

কিন্তু সার্জেন্ট–

একটু চুপ করে আমার কথা শুনবে? এ গল্পটা খুব সহজ সরল নয়। তুমি বারবার বাধা দিলে আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না সবটা।

সরি, সার্জেন্ট।

এখন ভালো করে চিন্তা করে দেখো মহিলার চিৎকার যখন শুনলে লোকটা তখন কোথায় ছিল?

সে... সে ... রাস্তার কোথাও ছিল। ওখানেই তাকে আমি দেখি। সে বাড়িতে ছিল না।

আর যে মহিলাকে তুমি দেখেছ বলে ভেবেছ, মিটফোর্ড, সে–?

ভেবেছি, সার্জেন্ট! ভাবব কেন? ওকে স্বচক্ষে দেখলাম তো!

ঠিক আছে, মিটফোর্ড। উত্তেজিত হয়ো না। তুমি বলছ মহিলা ছিল মৃত?

হ্যাঁ, শান্ত গলায় বলল মিটফোর্ড। তাকে দেখাচ্ছিল...দেখাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ভয় পেয়ে যাই, সার্জেন্ট।... তার জিভ বার হয়ে ছিল...আর ওই বিকট গন্ধ...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। বলেছ তো তুমি। সে কতক্ষণ আগে মারা গেছে বলে তোমার ধারণা?

তরুণ পুলিশ কনস্টেবল জবাব দিল না। সে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

বলো, মিটফোর্ড। তোমার নিশ্চয়ই কোনো ধারণা আছে। তুমি যখন তাকে দেখলে সে কি ওই সময়েই মারা গিয়েছিল? রাস্তায় যে লোকটাকে তুমি দেখেছ সে কি ঠিক ওই সময়েই মহিলাকে হত্যা করেছিল?

না, সার্জেন্ট, মিটফোর্ড আবার শিরদাঁড়া খাড়া করল চেয়ারে। না, মহিলা তখন মারা যায়নি। আর আমি মহিলাকে দেখার আগে আগেও লোকটা তাকে হত্যা করেনি।

তুমি কী করে জানো?

কারণ... কারণ মহিলা যখন কাঁদছিল আর চিৎকার করছিল তখন সে ওই বাড়িতে ছিল না। আর- ওহ, মাই গড–মহিলা তো মারা গেছে বহু দিন। আগে। আমি যে জিনিসটা দেখেছি–

ঠিক আছে, মিটফোর্ড। ঠিক আছে। আজ রাতটা তোমার খুব খারাপ গেছে। তবু বাকি ঘটনা তোমার জানা থাকা উচিত। রেনার স্ট্রিটে তুমি যে লোককে দেখেছ সে-ও বহুবছর আগে মারা গেছে। না, প্রশ্ন কোরো না। আমি সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারব না। আমি শুধু তোমাকে যা ঘটেছে তা-ই বলতে পারব। তুমিই প্রথম পুলিশম্যান নও যে এ ঘটনা দেখেছ। আজকের এই দিনে আগেও এমনটি ঘটেছে। শুনে কিছু বোধগম্য হলো?

মাথা ঝাঁকাল মিটফোর্ড। অন্তত বুঝতে পারলাম আমি পাগল হয়ে যাইনি, সার্জেন্ট। অন্যান্য পুলিশরাও যদি একই ঘটনা দেখে থাকে–

দেখেছে! এখন শোনো। জনৈক ডাক্তার–ডা. জোনাথন টেনিসন এবং তাঁর স্ত্রী রেনার স্ট্রিটে ৩ নম্বর বাড়িতে বাস করতেন। ডাক্তার হিসেবে সুখ্যাতি ছিল তাঁর। সবাই তাকে পছন্দ করত। তবে তাঁর স্ত্রী ছিল খুবই ঝগড়াটে স্বভাবের। আর প্রচুর মদ খেত। মাতাল হয়ে প্রায়ই ডাক্তারের গায়ে হাত তুলত। একবার সে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করে। এক গভীর রাতে ডাক্তার এক অসুস্থ লোককে দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। মহিলা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছিল। সে কান্নাকাটি করছিল, চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। ডাক্তার ছিলেন বেজায় ক্লান্ত এবং রোগীকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। স্ত্রীর মাতলামি তাঁকে

ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র করে তোলে। তিনি মোটেই হিংস্র স্বভাবের ছিলেন না, মিটফোর্ড। কিন্তু সেবার তিনি খুবই ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠেন। মহিলা বিছানায় শুয়ে তাঁর স্বামীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। সহ্য করতে না পেরে ডাক্তার তার গলা টিপে ধরেন। শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায় মহিলা। স্ত্রীকে মেরে ফেলেছেন বুঝতে পেরে উদ্ভ্রান্তের মতো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান ডাক্তার।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব রইল।

ডাক্তারের কী হলো, সার্জেন্ট? অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ হলো মিটফোর্ডের প্রশ্নে।

তিনি পাগলের মতো ছুটছিলেন। দৌড়াতে দৌড়াতে লণ্ডন রোডে চলে আসেন। রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পড়ে যান গাড়িঘোড়ার মাঝখানে। একটি ভারী লরি তাকে চাপা দেয়।

আবার নিশ্চুপ হয়ে গেল মিটফোর্ড।

এসব কবে ঘটেছে, সার্জেন্ট? জিজ্ঞেস করল সে একসময়।

দশ বছর আগে। জুলাইয়ের ১৩ তারিখ, রাত আড়াইটার দিকে।

আর একটা সাদা গাড়ি যে দেখলাম? গল্পের সঙ্গে ওটার কী সম্পর্ক?

কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা ২২ নম্বর বাড়ির মালিকের গাড়ি। সে গাড়িটি ৩ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ওখানকার রাস্তা চওড়া, তাই। ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে ওই বাড়িতে আর কেউ বাস করে না।

চুপ করে গেলেন সার্জেন্ট টমাস। তারপর বললেন, তুমি ডিউটি বুকে তোমার রিপোর্ট লিখে যাও, মিটফোর্ড। তারপর বাড়ি যাও। তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।

একটি কলম নিল মিটফোর্ড। ৩ নম্বর বাড়িতে যা দেখেছি তা নিয়ে কি রিপোর্ট লিখব, সার্জেন্ট?

না, বললেন সার্জেন্ট টমাস। ও নিয়ে তোমাকে কিছু লিখতে হবে না।

# পিশাচের দ্বীপ

ইতিহাসের ছাত্র এলিয়টের প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান রোম ও গ্রিস সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ছিল। তাই সে ফ্রান্সের মার্সাই থেকে প্রথমে রোমে এবং তারপর ইতালি হয়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে এসে পৌঁছাল। সেখান থেকে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করা একটি যাত্রীবাহী জাহাজে চড়ে বসল। তারপর ঘুরে বেড়াতে লাগল দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। সংগ্রহ করতে লাগল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

ইকারিয়া থেকে জাহাজ ছাড়বার পর সমুদ্রে ঝড় উঠল। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজের ইঞ্জিনগুলি বন্ধ করে দেয়া হলো। ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে জাহাজ শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়। ঝড় থামলে আবার চলতে আরম্ভ করে। গন্তব্যস্থল তাইকলাডিস দ্বীপমালা।

সুনীল জলরাশি ভেদ করে বেশ স্বাভাবিক গতিতেই জাহাজ চলছিল। হঠাৎ অদূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ চোখে পড়ল এলিয়টের।

চোখে বিইনোকুলার লাগিয়ে সেদিকে নজর দিল এলিয়ট। চোখের সামনে ভেসে উঠল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি দ্বীপ। কিন্তু এ কোন দ্বীপ? সে যদুর জানে এদিকে কোনো দ্বীপ নেই।

ক্যাপ্টেনকে ডেকে দ্বীপটির কথা বলতে ক্যাপ্টেন বললেন, হ্যাঁ, আমিও দেখছি দ্বীপটি। ওটা একটা ছোটো দ্বীপ।

ওখানে কারা থাকে?

তাচ্ছিল্যের স্বরে ক্যাপ্টেন বললেন, থাকে কয়েক ঘর গরিব প্রজা।

কিন্তু ঐ দ্বীপটির চারপাশে যে উঁচু প্রাচীরের বেস্টনী আছে তা লক্ষ্য করেছেন কি?

ঈজিয়ান সভ্যতার নিদর্শন ওটা। এখানে প্রায় সব দ্বীপেই এটা দেখা যায়।

এলিয়ট বলল, আচ্ছা, ওখানে কি একবার যাওয়া যায় না?

যাওয়া যাবে না কেননা? কিন্তু ঐ ভগ্নদ্বীপে গিয়ে আপনার কী লাভ? ওখানে না পাবেন থাকার জায়গা, না পাবেন ভালো খাবার।

দেখুন, তা আমি জানি। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি ওখানে না গেলে তা সফল হবে না।

আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন বলুন তো? ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে বিরক্তি।

আমি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখতে চাই, জানতে চাই, পরিচিত হতে চাই সেই সভ্যতার সঙ্গে।

কিন্তু ওখানে তেমন কোনো নিদর্শন নেই দূর থেকে যে প্রাচীরটি দেখছেন, হয়তো ওটাই একমাত্র নিদর্শন।

আমি প্রাচীরটিই দেখতে চাই।

কিন্তু আমাদের জাহাজ ঐ দ্বীপে যাবে না।

বেশ তো, আপনার জাহাজ না যাক, জাহাজ থেকে আমাকে একটা নৌকা দিন আমি তাতে চেপে ওখানে যাব। এলিয়টের স্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠে।

দেখুন, দ্বীপটি এখান থেকে অনেক দূরে। আপনি যদি নৌকায় করে সেখানে গিয়ে এই জাহাজে আবার ফিরে আসতে চান, তাহলে অনেকটা সময় লাগবে। আর জাহাজ কতক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করবে?

দেখুন, আমি হাওয়া খেতে বের হইনি। বেরিয়েছি ঈজিয়ানের দ্বীপগুলি দেখতে। তা যদি না পারি, তবে আর এত কষ্ট করে জাহাজে চাপা কেনো? আপনি একটি নৌকা ও আপনার জাহাজের একজন কর্মীকে দিন–আমি তাকে নিয়েই ঐ দ্বীপে যাব।

আপনার সঙ্গে যদি আমি তোক দিই, সে কিন্তু ঐ নির্জন অজানা দ্বীপে নামতে চাইবে না, বা আপনার সঙ্গে রাতে থাকতেও রাজি হবে না।

তার কোনো দরকার নেই।

তা হলে আপনি ফিরবেন কী করে?

সে জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। ওখানে একবার পৌঁছাতে পারলে আমি ঠিক ফিরতে পারব।

এলিয়টকে কিছুতেই ঐ অজানা দ্বীপে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে ক্যাপ্টেন একবার শেষ চেষ্টা করলেন–এবার তার স্বরে মিনতি ঝরে পড়ল–আপনার কি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঐ দ্বীপে না গেলেই নয়?

আমার বিপদ হবে ভাবছেন কেনো?

তাহলে আপনি যাবেনই।

হ্যাঁ, তবে আপনি আমাকে নৌকা ও মাঝি না দিলে সে ইচ্ছা পূরণ হবে কী করে?

শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এলিয়টকে একটি নৌকা দিতে বাধ্য হলেন।

নৌকার মাঝি এলিয়টকে সেই অজানা নির্জন দ্বীপে পৌঁছে দিয়েই দ্রুত জাহাজে ফিরে এল।

দ্বীপে পৌঁছেই একটি গ্রাম্য মেঠো পথ ধরে এলিয়ট এগিয়ে চলল।

পথ জনহীন। সমুদ্রের তীরে অবশ্য কয়েকখানা নৌকা দেখা গেল। তাতে লোকজন আছে কি না বোঝা গেল না।

কিছুদূর এগোতেই একটি সরাইখানা চোখে পড়ল। সরাইখানার পাশে একটি পাহাড়। তার নিচে ছাগল চরে বেড়াচ্ছে।

গোটা দ্বীপ ঘিরে রেখেছে যে প্রাচীর তা এলিয়টের কাছে এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। কবে কারা এমন উন্নত ধরনের প্রাচীর তৈরি করেছিল?

ঐ দ্বীপের একমাত্র সরাইখানায় ঢুকে এককাপ ছাগলের দুধ পান করে আবার চলতে শুরু করল এলিয়ট। তবে তখনও মসৃণ উঁচু পাঁচিলের বাইরেই সে। প্রাচীর যখন আছে তখন তার গেটও আছে–এটা অনুমান করে সে প্রাচীরের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলো। উদ্দেশ্য প্রাচীরের ভিতরে ঢোকার গেটটি খুঁজে বের করা।

প্রাচীরের চারদিকে কোনো গেট খুঁজে পেল না এলিয়ট। প্রাচীরটি প্রাচীন হলেও তা ভেঙে ভিতরে ঢোকার উপায় নেই–কারণ সেটি বেশ মজবুত। আর টপকানোরও কোন উপায় নেই কারণ সেটি মসৃণও। প্রাচীরের যে মুখটি খোলা সেটি আবার সমুদ্রের দিকে, আর সেখানেই কয়েকটি নৌকা বাঁধা আছে। এতএব একমাত্র নৌকা ছাড়া প্রাচীরের ভিতরে ঢোকা অসম্ভব।

কীভাবে প্রাচীরের ভিতর ঢুকবে ভাবতে ভাবতে এলিয়ট মৃদুপায়ে এগোচ্ছিলো, হঠাৎ একটি কলতান কানে এল। মনে হলো কোনো জায়গা থেকে পানি বের হচ্ছে বা প্রবেশ করছে।

শব্দটা যেন দেওয়ালের গা থেকেই আসছে। দেওয়ালে কান পাততেই বুঝতে পারলো শব্দটা দেওয়ালের ভিতর থেকে আসছে। খুব ভালোভাবে দেওয়ালের দিকে নজর দিতেই একটি ফাটল চোখে পড়ল।

দূরবিন চোখে দিয়ে সেই ফাটলে চোখ রাখতেই এলিয়টের চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল।

প্রাচীরের ভিতরে একটি ছোটো ঝরণা দিয়ে ঝিরঝির করে জল ঝরে পড়ছে। ঝরণার পাশে মা ও ছেলের মর্মর মূর্তি। ছেলেটা মায়ের কোলে ওঠার চেষ্টায় তার হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধরেছে।

কী অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী ঐ মর্মর নারী মূর্তিটি আর তার সন্তানের চোখে মায়ের কোলে ওঠার জন্য কী গভীর আকুলতা। দুটি মূর্তিই যেন জীবন্ত। মা একটু নীচু হয়ে আছে ছেলেটিকে কোলে তুলে নেওয়ার আগ্রহ নিয়ে।

কোন যুগে কোন ভাস্কর এমন মূর্তি তৈরি করেছিল কে জানে? কোন বইতে বা প্রত্নতত্ত্ববিদের আবিষ্কারে তো এই দ্বীপ ও তার ভাস্কর্যের কথা লেখা হয়নি।

এই দ্বীপে আসা তাহলে ব্যর্থ হয়নি। এখানকার এই ভাস্কর্যের কথা এলিয়ট সমগ্র বিশ্ববাসীর দরবারে পৌঁছে দেবে। এই আবিষ্কারের একমাত্র সাক্ষী সে। সেই হবে এই আবিষ্কারের কর্ণধার। কিন্তু এই মূর্তি দুটিকে এখান থেকে নিজের দেশে না নিয়ে গেলে তো আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

এই মূর্তি দুটি তার দেশের মিউজিয়ামের শোভা যেমন বৃদ্ধি করবে, তেমনি তার পাশে তার নামও থাকবে। এই বাগানের মালিককে খুঁজে বের করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সে আবার ফিরে এল সেই সরাইখানায়।

.

সরাইখানার যে কামরায় তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে নিজের জুতা পরিষ্কার করার জন্য এলিয়ট ব্যাগ থেকে ব্রাশ আর কালি বের করে জুতায় কালি করতে যাবে, হঠাৎ শুনতে পেলো কে যেন বলছে–দিন আমি করে দিচ্ছি।

পেছন ফিরে এলিয়ট দেখল বছর পনেরোর একটি ছেলে দরজার কাছে। দাঁড়িয়ে আছে। সে এলিয়টের হাত থেকে জুতাটা নিয়ে তাতে কালি দিতে লাগল আর এলিয়ট সেদিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইল। এলিয়ট ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল–প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ঐ বাগানটার মালিক কে বলতে পার?

না, আমি জন্ম থেকেই ওটাকে অমন দেখছি।

তুমি না জানতে পার, কিন্তু তোমার বাবা-মা নিশ্চয়ই জানেন।

আমার বাবা মা কেউ নেই। তবে যতদূর জানি গরডন নামে একজন ঐ বাগানের মালিক।

তুমি আমাকে তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পার?

কী করে পারব, ঐ পাঁচিলের ভিতরে ঢোকার তো কোনো পথ নেই।

কিন্তু সমুদ্রের দিকের পথ তো ভোলা। ছেলেটি একথা শুনে কোনো জবাব দিল না। এলিয়ট তাকে তার পারিশ্রমিক দিতে সে মৃদু হেসে চলে গেল।

এলিয়টের ঘরের সামনে তখন কয়েকজন কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছিল।

এলিয়ট তাদের ভিতর একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল–আমি ঐ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগানের মালিকের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। আপনাদের মধ্যে কেউ কি আমাকে সে সুযোগ করে দিতে পারেন?

এলিয়টের কথা শুনে আঁতকে উঠে সকলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

এলিয়ট জানত এই লোকগুলো খুব গরিব তাই এদের টাকার লোভ। দেখালে এরা তাকে তার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দিতে দ্বিধা করবে না, তাই সে অনেকগুলো টাকা বের করে বলল–দেখ, তোমাদের মধ্যে আমাকে ঐ পাঁচিল ঘেরা বাগানের ভিতর যে নিয়ে যাবে তাকে আমি একশো ড্রাকমা দেবো।

কিন্তু এলিয়টের প্রস্তাবে কেউ সাড়া দিল না।

সমস্ত গ্রাম খুঁজেও এলিয়ট একটি লোককেও পেল না যে, তাকে ঐ পাঁচিল ঘেরা বাগানের ভিতর নিয়ে যাবে। তারা ঐ প্রাচীরের নাম শুনেই ভয়ে আঁতকে উঠে দ্রুত পালিয়ে গেল।

অগত্যা নিতান্ত নিরাশ হয়ে ওকে আবার সরাইখানায় ফিরে আসতে হলো।

.

গভীর রাত।

সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু এলিয়টের চোখে। তার চোখের সামনে তখন শুধু একটি দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তা ঐ মা ও ছেলের প্রস্তর মূর্তির।

এমন সময় পদশব্দ শুনে ফিরে দেখল তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সকালের সেই জুতা পালিশ করা ছেলেটা।

এত রাতে এই ছেলেটা এখানে কেনো? ও কোথায় থাকে? ও কি এই সরাইখানাতে থাকে?

এলিয়ট ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করার আগেই সে এগিয়ে এসে এলিয়টকে বলল–আমি আপনাকে আমার নৌকায় করে ঐ পাঁচিল ঘেরা বাগানের ভিতর নিয়ে যাবো। আমায় একশো ড্রাকমা দেবেন তো?

কেন দেবো না। নিশ্চয় দেবো। তবে আমরা যাবো কখন?

কাল সকালে। তবে কথাটা কাউকে যেন বলবেন না।

বেশ, তাই হবে।

ছেলেটি চলে গেল। এলিয়টের মন আবার স্বপ্নের জাল বুনতে বসল। সে ঐ বাগানের ভিতর থেকে মা ও ছেলের মূর্তি দেশে নিয়ে যাবে। ওটা একটি পরম বিস্ময় হিসেবে মিউজিয়ামে শোভা পাবে। তার নামও প্রত্নতাত্ত্বিকের খাতায় লেখা থাকবে।

পরেরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই এলিয়ট এসে হাজির সমুদ্রতটে।

সেই ছেলেটি একটি পালহীন ছোটো নৌকায় সেখানে অপেক্ষা করছিল।

এলিয়ট এসে নৌকায় পা রাখতেই ছেলেটি নৌকা ছেড়ে দিল। পাঁচিলটির বিপরীত দিকে তাকিয়ে সে নৌকা বেয়ে চলল। ওদিকে সে তাকাতেই চায় না। কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব ছেলেটির চোখে মুখে।

হঠাৎ নৌকাটা থেমে গেল।

এলিয়ট দেখল একটি কালো পাথরের গায়ে নৌকাটা থেমেছে।

কী, এসে গেছি?

হ্যাঁ, আমি কিন্তু আর এগোব না। আপনি কি আমার পাওনাটা এখনি মিটিয়ে দেবেন?

কেন দেব না। এই নাও। মানি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে এলিয়ট ছেলেটিকে দিল। তারপর বলল–আর একটু এগিয়ে নিয়ে চল না। ঐ তো ঘাট দেখা যাচ্ছে।

এখানে কোনো ঘাট নেই। আমি যে পর্যন্ত আসতে পারি এসেছি আর এক কদমও এগোতে পারব না।

বেশ তো তোমার নৌকাটি তবে খানিকক্ষণের জন্য আমায় ধার দাও–আমি ওখানে পৌঁছে মালিকের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব।

না। আমি তা পারব না। বলে সে বৈঠা তুলে নৌকাটাকে দূরে সরিয়ে নিতে গিয়ে তাল সামলাতে না পেরে জলের ভিতর পড়ে তলিয়ে গেল।

যে ছেলেটি এত কষ্ট করে এলিয়টকে এখানে নিয়ে এসেছে দ্বীপবাসীর কথা অগ্রাহ্য করে তাকে এভাবে চোখের সামনে ডুবে মরতে দিতে চায় না এলিয়ট। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার অচেতন দেহটাকে টেনে হেঁচড়ে পানি থেকে তুলে নিয়ে এল।

বালির চরায় পৌঁছে অনেক কসরত করে ছেলেটির পেট থেকে পানি বের করে তাকে সুস্থ করে তুলতেই ছেলেটি অবাক হয়ে এলিয়টের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সে দিকে তাকিয়ে এলিয়ট বলল–এখন কেমন বোধ করছ?

ছেলেটির মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হলো না। এলিয়ট তাকে সেখানে বসিয়ে রেখে নৌকা খুঁজতে বের হলো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে নৌকাটাকে পাওয়া গেল। নৌকায় উঠে সেটিকে তীরের দিকে এনে নোঙর করে চেয়ে দেখল ছেলেটা একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছে।

কি হে, এখন আর আমার সঙ্গে যেতে তোমার কোনো আপত্তি নেই। তো? আপত্তি থাকলে এখানে অপেক্ষা করো। আমি বাগানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে আসছি।

ছেলেটি নির্বাক। মুখ থেকে কোনো টু বের হচ্ছে না দেখে এলিয়টের বেশ রাগ হলো। চিৎকার করে বলল–কি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না।

তবুও কোনো জবাব নেই। এবার এলিয়ট এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির কাঁধে হাত রাখল এবং সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিল। এতো মানুষের দেহ নয়। এ যে নিরেট পাথর।

এটা যদি পাথরের মূর্তি হয় তবে ছেলেটি কোথায় গেল? একথা মনে হতেই সাগরের যে বেলাভূমিতে ছেলেটিকে শুইয়ে রেখে সে নৌকার খোঁজে গিয়েছিল সেখানে গেল।

সেখানে বালির উপরে শায়িত ছেলেটির ছাপ দেখতে পেল এলিয়েট। আরও একটি পদচিহ্ন চোখে পড়ল। খুব সম্ভবত কোন নারীর পায়ের ছাপ।

তখনই ইতিহাসের ছাত্র এলিয়টের একটি পৌরাণিক কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সেটার তো কোনো ঐতিহাসিক স্বীকৃতি নেই। সেটা তো নিছক একটা কিংবদন্তি। গ্রিক পুরাণে বর্ণিত কাহিনীটি হলো স্থেনো, মেডুসা ও ইউরিয়েল নামে তিন দানবী বাস করত গরগন দ্বীপে। তারা ছিল মানুষের কাছে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

তাদের মাথায় চুলের বদলে থাকত জীবন্ত সাপ। ওরা দেখতে এত কদাকার ছিল যে, যে কেউ ওদের দিকে তাকালে সে পাথরে পরিণত হয়ে যেত।

এসব কাহিনী যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ তো তার সামনেই। ঐ তো খানিক আগে যে ছেলেটির সঙ্গে এলিয়ট কথা বলেছে, সে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এলিয়টের তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে, কেনো গোটা দ্বীপ থেকে এই প্রাচীর ঘেরা স্থানটি বিচ্ছিন্ন। কেনো এই জায়গাটার কথা স্থানীয় লোকেরা মুখে পর্যন্ত আনতে চায় না। কেনো গরিব হয়েও লোকগুলো তার অতগুলো টাকার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছিল, কেনো ছেলেটি ঐ প্রাচীরের দিকে না তাকিয়ে নৌকা চালাচ্ছিল।

এই সেই গরগনের বাগান। পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত কাহিনীতে জানা যায় মহাবীর পারসিউস তিন দানবীর মধ্যে মেডুসাকে হত্যা করতে সমর্থ হন, কিন্তু নো ও ইউরিয়েলকে হত্যা করতে পারেননি। কিন্তু সে তো কয়েক সহস্র বছর আগের কাহিনী। তারা কি এখনও বেঁচে আছে? তারা কি অমর? এসব নানান চিন্তা ঐ নির্জন দ্বীপের জমিতে দাঁড়িয়ে এলিয়টের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কিংবদন্তি যে সত্যে পরিণত হতে পারে এটা তো এলিয়টের কল্পনাতেও স্থান পায়নি। কিন্তু বাস্তব তো তার সামনে। ঐ তো ঈষৎ ঘাড় বাঁকানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তার দেখা সেই ছেলেটা। ওর কাঁধে এখনও সমুদ্রের নোনা জল লেগে আছে। ওকে দেখে

মনে হচ্ছে জীবন্ত গ্রিক ভাস্কর্যের প্রতিরূপ। তাহলে তো ঐ মা ও ছেলের মূর্তিটিও এমনই একটি জীবিত মা ও ছেলের প্রতিমূর্তি।

ভাবনার স্রোত বেশি দূর গড়ানোর আগেই পেছনে লঘু পদ সঞ্চারের শব্দ শোনা গেল। মনে হলো কেউ যেন গাউন পরে তার দিকে আসছে। সমুদ্রের হাওয়ায় গাউনের খস্ খস্ শব্দ কানে আসছে। খুব কাছে থেকে একটি সুরভিত সুগন্ধি ভেসে এল। যা কেবল কোনো নারীর দেহ থেকে পাওয়া যায়। এবার শোনা গেল একটি ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর। সে ভাষা বোঝার সাধ্য নেই এলিয়টের।

এলিয়টের বুঝতে বাকি রইল না যে, মূর্তিমতি মৃত্যু তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে দিকে তাকালে সেও পাথরে পরিণত হবে।

এলিয়ট পেছন ফিরে না তাকানোর সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলল কিন্তু এক দুর্নিবার শক্তি তাকে বার বার পিছু ফিরে তাকানোর জন্য তাড়না শুরু করল। তাকাবে না তাকাবে না করেও সে ফিরে চাইল...

# প্রতিহিংসা

লোকটা সূর্য ওঠার পরপর বেরিয়ে পড়েছে, এখন পাহাড়ের নিচের বালুর সরু রাস্তাটা ধরে হাঁটছে। আবর্জনার কথা বাদ দিলে জায়গাটা হাঁটাহাঁটির জন্য বেশ ভালো। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভাররা ফাস্টফুডের আঠালো ব্যাগগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিচের ভাঙা বীচ চেয়ার লক্ষ্য করে। ওদিকে নজর দেয় না লোটা, তবে আজ সকালে দুটো মস্ত বোল্ডারের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাতে তার চোখ আটকে গেল। কৌতূহল বোধ করার কারণ আবর্জনা থেকে আলাদা জিনিসটা। সে হেঁটে গেল ওখানে। হাতে তুলে নিল ওটা। ঘষা খেয়ে চামড়া ছিলে গেছে সামান্য, নিচের দিকটাতে বড়োসড় একটা ফাটল। তবে পাহাড়চূড়া থেকে ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও এটা ভেঙে টুকরো হয়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য। ল্যাচের উপর আঙুল বোলাল সে, শক্ত ভাবে বন্ধ। তা ছাড়া হিমে তার হাতও খানিকটা অসাড়। সমতল একটা পাথরের উপরে বসল সে, ফুঁ দিতে লাগল আঙুলে। হাত গরম হলে আবার চেষ্টা চালাবে সে।

.

মাস তিনেক আগের ঘটনা। পাহাড়ি রাস্তাটা থেকে মাইল কয়েক দূরে ষোড়শী অ্যাবি রজার্স তার পরিবারের সঙ্গে নিজেদের নতুন বাড়িতে যাচ্ছিল। অবশ্য বাড়িটি একেবারেই নতুন নয়। অ্যাবির মা ডিয়ানার মতে, এ বাড়ি ১৮৭০ সালের তৈরি, তবে সংস্কার করা হয়েছে বহুবার।

প্রাগৈতিহাসিক বাড়ির মতো লাগছে, নাক সিঁটকাল লিন্ডসে। অ্যাবির একমাত্র ছোটো বোন সে, বয়স দশ। যে কোনো পুরোনো জিনিসই তার কাছে ডিসগাস্টিং, কোনো কিছু মনঃপূত না হলে এ শব্দটাই সে ব্যবহার করে। আগের বাড়িটাই ভালো ছিল। কী অসাধারণ সুইমিংপুল!

আর ও বাড়ির খরচও ছিল অসাধারণ, বললেন ডিয়ানা। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স ঠকাশ করে নামিয়ে রাখলেন সামনের ছোটো বারান্দায়, আঙুল দিয়ে চোখের উপরে পড়া চুল ঠেলে সরালেন।

আগের বাড়িতে গাছপালার খুব অভাব ছিল, বলল অ্যাবি। এখানে তা নেই। বাড়ির পেছনের ওই জঙ্গলে তুই গাছ-বাড়ি বানিয়ে নিতে পারবি, লিন্ডসে।

লিন্ডসের চেহারা থেকে বিরক্তির ভাবটা চলে গেল।

গুড আইডিয়া, মন্তব্য করলেন ওদের মা। তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলেন। খুলে গেল সদর দরজা। জায়গাটা সুন্দর, না? এ বাড়িতে আজ আমাদের প্রথম রাত।

কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম উৎসাহ নেই অ্যাবির। বাবার সাথে মার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বছর চারেক আগে, ও বাড়ির সুদের হার দিন দিন বেড়ে চলছিল।

মার পক্ষে প্রতি মাসে অতগুলো টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই পুরোনো বাড়িটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ওরা। অবশ্য তাই বলে শহরের বাইরে চলে যায়নি তারা, নিজেকে মনে করিয়ে দিল অ্যাবি। আগের স্কুলেই যাবে ও, সেখানে পুরোনো বন্ধু-বান্ধবরাই থাকছে। এ বছর মার্ক হেলপার্ন হয়তো ওকে প্রেম নিবেদন করে বসতেও পারে।

তবু, পুরোনো পড়শীকে ছেড়ে আসতে খারাপই লাগছিল অ্যাবির। তবে নতুন বাড়িটি দেখার পরে ওটার প্রেমে পড়ে যায় সে। অথচ ওটা শতাব্দী প্রাচীন একটি বাড়ি। উঠোন ভর্তি আগাছা। আর বাড়ির ঢালু ছাদ এবং লম্বা পুরোনো জানালাগুলোর মধ্যে কী যেন একটা আছে। অ্যাবির মনে হয়েছে বাড়িটা ওকে হাত বাড়িয়ে ধরতে আসছে।

তারপরও বাড়িটি কেননা যে ভালো লেগে গেছে অ্যাবি নিজেই জানে না।

প্রথমবার এ বাড়ি দেখার পরে এখানে চলে আসার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণছিল সে।

প্রথম রাতে ডিনার শেষে ডিয়ানা একটা কাগজের ব্যাগ হাত দিয়ে চেপে সমান করে তাতে লিস্ট লিখতে বসে গেলেন। লিখলেন জানালাগুলো সারাতে হবে, রঙ করতে হবে প্রতিটি ঘর, রান্নাঘরে পর্দা টাঙানো দরকার, চিলেকোঠার ঘরও পরিষ্কার করতে হবে।

আমি চিলেকোঠার ঘর পরিষ্কার করব, কিছু না ভেবেই বলল অ্যাবি।

সত্যি করবি? কৌতূহল নিয়ে মা তাকালেন মেয়ের দিকে। ওখানে গেলে তো গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবি। ও ঘরে জানালা টানালা কিছু নেই। তোর গন্ধঅলা, বন্ধ ঘর একেবারেই সহ্য হয় না?

তবু আমি কাজটা করব, বলল অ্যাবি। মার অবাক হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। ছোটো, আলো-বাতাসহীন ঘর, এলিভেটর, ক্লজিট ইত্যাদি আতঙ্কিত করে তোলে অ্যাবিকে। কিন্তু চিলেকোঠার ঘর এমন টানছে ওকে, দেখার তর সইছে না।

পরদিন সকালে, মা কাজে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে, অ্যাবি ওর ঝলমলে সোনালি চুল বেঁধে ফেলল একটা রুমাল দিয়ে, দোতলার ঘরের মই নিয়ে এল। ধাপ বাইতে শুরু করল। মা প্রচণ্ড গরম লাগবে বলেছিল। কিন্তু অ্যাবি কানে তোলেনি কথাটা। চিলেকোঠা এত গরম কল্পনাও করেনি সে। তাপটা যেন জ্যান্ত, ঘন আর ভারী, যেন একটা হাত চেপে ধরছে ওকে, বন্ধ করে দিচ্ছে দম, মাথা ঘুরতে লাগল। চিমনির ইটের গায়ে হেলান দিল অ্যাবি, চোখ বুজল। মুখ ভরে গেছে ঘামে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে শুরু করেছে গাল বেয়ে। হাত দিয়ে কপাল মুছল অ্যাবি, ধীরে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল। বাইরে থেকে ভেসে এল হাতুড়ির অস্পষ্ট ধাতব আওয়াজ লিন্ডসে তার গাছবাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। পাখির কিচিরমিচিরও শোনা যাচ্ছে, মাঝেমধ্যে হুশ করে চলে যাওয়া দুএকটা গাড়ির শব্দ। কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ মেলল অ্যাবি।

ছাদ যেখানে মেঝের সঙ্গে মিশেছে, সূর্যের আলোর ফালি ঢুকছে ওখান থেকে। মাকড়সার জাল নাচছে বাতাসে। ছাদের মাঝখানে ঝুলছে একটা নগ্ন বাল্ব। ওটার লম্বা রশিটা অ্যাবির নাগালের মধ্যে, হাত বাড়ালেই ধরা যায়। রশি ধরে টান দিল অ্যাবি। মৃদু আলো জ্বলে উঠল, যদিও ঘরের দূরবর্তী কোণাগুলোতে ছায়া থেকেই গেল।

তীব্র উত্তাপ, বন্ধ ঘর, মাকড়সার ভয়ের যে কোনো একটি কারণই অ্যাবির এখান থেকে ছুটে পালানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ওর জন্য কিছু একটা অপেক্ষা করছে এখানে। ওটার উপস্থিতি টের পাচ্ছে অ্যাবি, উপলব্ধি করতে পারছে গুমোট ছায়ার মাঝে কিছু আছে।

অদ্ভুত এক ব্যাকুলতায় অ্যাবি এগিয়ে গেল স্তূপ করা ভাঙা কার্ডবোর্ডের বাক্স, কাগজের ব্যাগ আর ভাঁজ করা ছেঁড়াখোঁড়া কম্বলের আবর্জনার দিকে। ওর জন্য কী অপেক্ষা করছে দেখবে। এক ঘণ্টা পাগলের মতো আবর্জনা ঘটল সে। কালি ঝুলিতে কালো হয়ে গেল হাত, জামা-টামা ধুলোয় নোংরা।

অবশেষে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সে।

একটা কাগজের ব্যাগ থেকে ওটাকে বের করে আনল অ্যাবি। ব্যাগটা অনেক পুরোনো। ফরফর করে ছিঁড়ে গেল। ওর হাতে চারকোনা একটা কাঠের বাক্স, ঘন ধুলোর আস্তরণ তাতে। কাগজ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করল অ্যাবি। বাক্সটা দেখতে বেশ সুন্দর, নরম কাঠ দিয়ে তৈরি, পিতলের ছিটকিনিটা চকচক করছে। অ্যাবির মনে হলো বাক্সটার মোটা কাঠ

ভেদ করে একটা শক্তি বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঢুকে যাচ্ছে ওর হাতে। কেঁপে উঠল অ্যাবি। দ্রুত ছিটকিনি খুলে ফেলল, তুলল ঢাকনা।

বাক্সের ভিতরে একটা পুতুল।

সাদা স্যাটিনের পোশাকটা অনেক দিন আগের বলে হলুদ রঙ ধরেছে, পুতুলটা একটা বাচ্চার মতো শুয়ে আছে। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা কালো চুল, পরনের জামাটা একশো বছর আগের ডিজাইনের। স্কার্ট লম্বা, কোমরের কাছটাতে চেপে বসেছে, উঁচু গলা ও লম্বা স্লিভে লেস বসানো।

চীনা মাটির মুখ, আকাশ নীল চোখজোড়া অ্যাবির মতো, পাপড়ি কালো, চেয়ে আছে।

আকাশ-নীল চোখজোড়া এত জীবন্ত, চাউনির মধ্যে শক্তিশালী ও ভীতিকর একটা ব্যাপার আছে, আঁতকে উঠল অ্যাবি।

মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও চোখ ঠিকরে পড়ছে ঘৃণা। তবে তা এক মুহূর্তের জন্যই। অ্যাবি বাক্স থেকে তুলে নিল পুতুলটাকে। ওটার চোখজোড়া এখন ফাঁকা ও নিষ্প্রাণ। কাঁচের নীল চোখ দম বন্ধ করা চিলেকোঠার নগ্ন বাল্বের ম্লান আলোয় ঝিলিক দিল।

চিলেকোঠার ঘরটি অর্ধেক পরিষ্কার করল অ্যাবি। তারপর পুতুলটাকে নিয়ে চলে এল নিজের ঘরে। স্যাটিনের স্কার্ট দিয়ে চেপে মোটামুটি ঠিকঠাক করে শেলফের লম্বা তাকে, স্টাফ করা কতগুলো প্রাণীর সাথে রেখে দিল। এগুলো গত বছর ওর বাবা মেক্সিকো থেকে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে পুতুলও আছে, রয়েছে আর্ট ক্লাসে নিজের হাতে তৈরি একজোড়া মাটির পাত্র এবং সাগর সৈকত থেকে কুড়িয়ে আনা কতগুলো ঝিনুকের খোলস। তাকে পুতুলটা বসে রইল রানির মতো, উদ্ধত এবং শীতল, মুখ ফেরানো অ্যাবির বিছানার দিকে।

এটাকে কেন যে তোমার মনে ধরল বুঝতে পারছি না, সে রাতে লিন্ডসে বলল তার বড়ো বোনকে। পুতুলটা খুবই পুরোনো আর ডিসগাস্টিং।

তোর কাছে ডিসগাস্টিং মনে হলেও আমার কিছু আসে যায় না, বলল অ্যাবি। বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে পুতুলটার দিকে। পুতুলটা দেখতে খুব সুন্দর। মা বলেছে এটা বোধহয় কোনো দামি অ্যান্টিক।

তাহলে বিক্রি করে দিলেই পারো। আমি হলে করতাম।

আমি জানি তুই তা করতি। বলল অ্যাবি। কিন্তু আমার বিক্রি করার ইচ্ছে নেই। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা কর, লিন্ডসে আমি ওকে মুক্ত করে দিয়েছি। ও এখন স্বাধীন নারী।

হুহ্, নাক দিয়ে বিদঘুঁটে শব্দ করল লিন্ডসে।

যা। এখন ভাগ। বলল অ্যাবি। আমার ঘুম আসছে। ঘুমাব।

লিন্ডসে তার ঘরে চলে যাওয়ার পরে বেডসাইড বাতিটা সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল অ্যাবি। পা টান টান করে শুলো। স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো ভেদ করেছে পাতলা, সাদা পর্দা, অ্যাবি দেখতে পেল আঁধারেও জ্বলজ্বল করছে। পুতুলটার চোখ। এ চোখ বোধহয় কখনও বন্ধ হয় না। মা বলেছে পুতুলটাকে সম্ভবত এভাবেই তৈরি করা হয়েছে, সারাক্ষণ খোলা থাকবে চোখ। পুতুলটার মাথাটা খুলে ভিতরের কলকজা দেখা যায়। তবে শরীর এত নরম, ভেঙে যেতে পারে ঘাড়। অ্যাবি অমন ঝুঁকি কখনোই নেবে না। সে চমৎকার একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে। অযথা ঘাঁটাঘাঁটি করে ওটাকে নষ্ট করবে না। পুতুলটার অদ্ভুত, স্থির চোখের চাউনির সাথে একসময় সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

.

সপ্তাহখানিক পরে শুরু হলো স্কুল, সেই সাথে অ্যাবির স্বপ্নেরও। ওর জীবনটাকে বদলে দেবে স্কুল, ভেবেছিল অ্যাবি। নতুন বাড়ি, নতুন ঘর, নতুন ক্লাস। কিন্তু অ্যাবি যখন স্বপ্ন দেখার আসল কারণ জানতে পারল ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

স্বপ্নের কথা ভুলে থাকতে চাইল অ্যাবি, কিন্তু ওগুলো তার মস্তিষ্কে সেঁটে থাকল আঠার মতো, দিনগুলোকে কালো মেঘের ছায়া দিয়ে ঘিরে রাখল, তাকে জাগিয়ে রাখল অনেক রাত অবধি, অ্যাবি পুতুলের পলকহীন চোখে চেয়ে জেগে থাকল।

স্বপ্নগুলো বড় অদ্ভুত, ছোটো ছোটো অর্থহীন দৃশ্যপট নিয়ে তৈরি। তবে তা আতঙ্কিত করে তুলল অ্যাবিকে। ঘুমের মধ্যে সে গোঙায়, মোচড় খেতে থাকে শরীর। তবে ঘুম ভাঙার পরে যা ঘটত তা ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আয়নায় নিজের চেহারা চেনা যায় না। যেন অন্য কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে। অ্যাবি প্রতি রাতে বিপদের স্বপ্ন দেখে আর তা ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই।

প্রথম শিকার হলো ওর বন্ধু আইরিন গ্রে।

সেদিন শুক্রবার রাত, স্কুলের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিন। আইরিনকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল অ্যাবি। তারপর অ্যাবির বাসায় থেকে গেছে আইরিন। ঘুমাবার আগে রাত একটার দিকে, আইরিন অ্যাবিকে বোঝাতে চাইছিল মার্ক হেলপার্নের সঙ্গে অ্যাবির ঠিক খাপ খাবে না।

আমি জানি ও ভদ্র ছেলে, স্লীপিং ব্যাগ থেকে মাথা বের করে বলল আইরিন। তবে কারও সঙ্গে ওর সম্পর্ক টেকে না। প্রতি সপ্তাহে নতুন কোনো মেয়ের সাথে দেখা যায় তাকে।

আমি কিন্তু ওকে বিয়ে করছি না, আইরিন, বলল অ্যাবি। আমি তো ওর সঙ্গে শুধু ডেট করব।

ওহ, অ্যাবি, ব্যাগ খুলে সিধে হলো আইরিন, হেঁটে গেল শেলফের কাছে। তাক থেকে পুতুলটাকে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাতের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ও তোমাকে ছেড়ে দিলে কিন্তু অনেক কষ্ট পাবে। পুতুলটাকে এবারে লোফালুফি করছে সে। এটার সমস্যা কী? চোখ বোজে না।

ও একটা পুতুল, এটা নয়। আর কেন চোখ বোজে না জানি না। বলল অ্যাবি, যাক তুমি মার্কের কথা বলছিলে।

আমি চাই না তুমি ছ্যাকা খাও, ঠিক আছে? আইরিন দেরাজের তাকে তুলে রাখল পুতুলটাকে, ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগে। আর তুমি ছ্যাকা খেয়েছ এ কথা শুনতেও চাই না।

হেসে উঠল অ্যাবি, নিভিয়ে দিল বাতি। কিছুক্ষণ পরে আইরিনের নিদ্রাতুর গলা ভেসে এল, অ্যাবি?

উ?

পুতুলটার চোখ দেখলে ভয় লাগে। কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। ওটার মুখ আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিই?

দাও। অ্যাবি ঘুম ঘুম চোখে দেখল আইরিন হেঁটে গেল ঘরের কোণে, আঁধারে তার লম্বা, সাদা টি শার্ট ঝাপসা লাগছে। আইরিন যখন ফিরে এলো, অ্যাবির ততক্ষণে চোখ লেগে গেছে। এক সেকেণ্ডের জন্য আবার জেগে উঠল সে ঝাঁকি খেয়ে, পিঠে বরফঠাণ্ডা কীসের যেন স্পর্শ পেয়েছে। এতই ঠাণ্ডা, উষ্ণ ঘরের মধ্যেও শিউরে উঠল। পরমুহূর্তে শীতল স্পর্শটা আর রইল না, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল অ্যাবি।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সে। একটা হাত। ছোটো, ফ্যাকাসে রঙের হাতটা। হলঘরে। অ্যাবি জানে না, দেখতেও পাচ্ছে না ওটা কী করছে। তবে জানে ওটা তার রুমের বাইরে, হলঘরে রয়েছে। হলঘরটাকে সে চিনতে পারছে কারণ দেয়ালের লতানো প্যাটার্নের ওয়াল পেপার আগের জায়গাতেই রয়ে গেছে, রঙ করা বেসবোর্ডও সে দেখতে পাচ্ছে। মা বলেছে ওখানে আসল কাঠ লাগিয়ে দেবে।

হাতটা রোগাটে, তবে চমৎকার গঠন। মেয়েলি হাত। ফ্যাকাসে রঙের একটা প্রজাপতির মতো মেঝের উপর ওটা উড়তে লাগল, সিঁড়ির মাথায় ভেসে রইল এক মুহূর্ত, তারপর মিলে গেল আঁধারে।

একটা চিৎকার শুনে জেগে গেল অ্যাবি।

ঘর অন্ধকার তবে হলঘর থেকে এক ফালি রূপোলি আলো ঢুকে পড়েছে। দরজার চৌকাঠ গলে। ওখান থেকে অস্পষ্ট গলা ভেসে আসছে। আইরিন কথা বলছে অ্যাবির মার সঙ্গে। বিছানা থেকে নেমে পড়ল অ্যাবি, পা বাড়াল দরজার দিকে।

আমি একটুর জন্য বেঁচে গেছি, শুনতে পেল আইরিন বলছে।

কী হয়েছে? হলঘরের আলোতে চোখ পিটপিট করল অ্যাবি।

তুমি ঠিক আছ তো? তোমার চিৎকার শুনলাম যেন।

ঘাড় ভাঙার মতো দশা হলে তুমিও চিৎকার দিতে, বলল আইরিন। খুব পিপাসা লেগেছিল আমার। নিচে যাচ্ছিলাম। কীসের সঙ্গে যেন পা বেঁধে যায় আমার। ঝুঁকে হাত দিয়ে হাঁটু ডলল আইরিন। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই।

কীসের সঙ্গে পা বাঁধল তোমার? উপরের সিঁড়িতে চোখ বুলালেন অ্যাবির মা। এখানে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

জানি না আমি, কপালে ভাঁজ পড়ল আইরিনের। কিন্তু কিছু একটা ছিল ওখানে। পরিষ্কার টের পেয়েছি।

সিঁড়ির মাথায় চোখ বুলাল তিনজন, তারপর পরস্পরের সঙ্গে চোখাচুখি হলো। অ্যাবির স্মৃতির কুঠুরিতে কিছু একটা খোঁচা দিচ্ছিল, কোনো একটা ছবি, কিন্তু মনে করতে পারছে না সে। শেষে যে যার বিছানায় ফিরে গেল ওরা।

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি, স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে বলল আইরিন। ভাগ্যিস ডিগবাজি খাইনি। তোমাদের সিঁড়িগুলো যা খাড়া!

হুঁ, বলল অ্যাবি। তোমার কিছু হয়নি দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করছি, বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল সে। আইরিন উঠে বসেছে টের পেয়ে চোখ মেলে চাইল। কী করছ তুমি?

পুতুলটার মুখ ঘুরিয়ে রাখছি, জবাব এল।

একবার না ঘুরিয়ে রাখলে!

রেখেছিলাম তো! ওটা বোধহয় আবার ঘুরে গেছে। কেমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

পরদিন, আইরিন চলে যাওয়ার পরে স্বপ্নের কথা মনে পড়ল অ্যাবির। ফ্যাকাসে হাতখানা উড়ছিল, প্রায় ভেসে ছিল সিঁড়ির মাথায়, ঠিক যেখান থেকে পড়ে যায় আইরিন। হাতটা কি ওকে ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করছিল যে ওখানে কিছু একটা ঘটবে?

.

দিন সাতেক বাদের ঘটনা। অ্যাবি, আইরিন ও তাদের বান্ধবী হলি রাসেল অ্যাবিদের রান্নাঘরে বসে পড়াশোনা করছে। ওদের পড়ার বিষয় সমাজ বিজ্ঞান। অ্যাবির ঘরে বসে পড়ার চেষ্টা করছিল হলি। তবে আইরিনের মতো তারও পুতুলটার চাউনি ভালো লাগেনি।

ভয়ঙ্কর চোখ, শিউরে উঠেছিল হলি। যেন সারাক্ষণ লক্ষ করছে আমাকে। তারপর বইখাতা নিয়ে চলে এসেছে কিচেনে।

রচনা লেখার পরীক্ষায় আমি কখনোই ভালো করতে পারি না, অনুযোগ হলির কণ্ঠে। প্রশ্নের ধরন কী হবে না জেনে বেহুদা পড়ার কোনো মানে হয়?

ঠিকই বলেছ, সায় দিল আইরিন, ফ্রিজ খুলে সোডার বোতল বের করছে। অ্যাবি তার পাশে কাউন্টারে দাঁড়ানো, বাটিতে পপকর্ন ঢালছে।

হলির কনুই টেবিলে ঠেস দেয়া, চিবুকে হাত। তার ঠিক মাথার ওপর ঝুলছে বৈদ্যুতিক বাতি। আলো পড়ে ঝলমল করছে কালো চুল। অ্যাবি কী যেন বলার জন্য ওর দিকে ঘুরল আর তখন ঘটে গেল ঘটনাটা।

সাবধান করে দেয়ার সময় পাওয়া গেল না। টেবিলের উপরে চেইন দিয়ে ঝুলছিল কাঁচের বাতি, খসে পড়ল হলির মাথার উপরে, কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো বিস্ফোরণের মতো।

রক্তে ভেসে গেল হলির মুখ। আইরিন দ্রুত ওর মুখের রক্ত মুছতে লাগল, তারপর ছুটে গেল অ্যাবির মার কাছে। বাতিটা খসে পড়ার মুহূর্তে চিৎকার করে উঠেছিল অ্যাবি, তারপর চুপ হয়ে গেছে। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো আতঙ্ক নিয়ে দেখল অতটা মারাত্মক নয় ক্ষত। দেখল মা আর আইরিন মিলে হলিকে সিধে হতে সাহায্য করছে, মা বলছেন তিনি হলিকে তার বাসায় পৌঁছে দেবেন। এসব দেখছে অ্যাবি, একই সাথে একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কাঁচের বাতিটা বনবন করে ঘুরছিল, এত জোরে ঘুরছিল যে রঙিন গ্লাস প্যানেল আলোর অদ্ভুত একটা ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করে ফেলেছিল টেবিলের উপরে। অ্যাবি দেখছিল ঝর্ণাধারাটার পাক খাওয়ার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে, ওর চোখ এমন ধাঁধিয়ে যায়, অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হয়। তারপর সে শব্দটা শোনে। ফোঁস করে শ্বাস ফেলেছিল কেউ। শব্দটা বাতির কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল। অ্যাবি ঘুরে তাকায়,

একটা হাত দেখতে পায় সে। ফ্যাকাসে সাদা, নরম হাত। এগিয়ে যাচ্ছিল বাতির দিকে। আঙুলের মৃদু স্পর্শে বাতির ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আরেকটা শব্দ শুনতে পায় অ্যাবি। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। হাতটার মতোই নরম এবং কোমল। তৃপ্তির নিঃশ্বাস।

এ দৃশ্যটা অ্যাবি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছিল। এখন মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো, হলির রক্তের ছিটে মাখানো বই-খাতার দিকে তাকিয়ে সে শিউরে উঠল। বুজে ফেলল চোখ। তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। সাবধান করে দেয়া হয়েছিল স্বপ্নের মাঝে। কিন্তু ঠিক সময়ে স্বপ্নের কথা মনে পড়েনি অ্যাবির, বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি বান্ধবীকে।

মাথায় চারটা সেলাই পড়ল হলির। এছাড়া সে ঠিকই আছে। তবে এ ঘটনা বা স্বপ্নের কথা কোনোটাই মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না অ্যাবি।

তারপর থেকে ঘুম হারাম হয়ে গেল অ্যাবির। রাতের বেলা দুচোখ এক করতে ভয় পায় সে। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে না জানি আবার কোন্ দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্নগুলো তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল ওকে।

.

কিন্তু অ্যাবিকে তো ঘুমাতে হবে। আর ঘুমানোর পরে যথারীতি স্বপ্ন দেখল সে। আর সে স্বপ্নের পরিণতি হলো আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আসলে স্বপ্ন নয়, বাস্তব। বিভীষিকাময় বাস্তবতা এটাই যে ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যায় যে বাধা দেয়ার সময় থাকে না। একরাতে সে মার চিৎকার শুনে ঘুম থেকে জেগে গেল। মা কর্কশ গলায় চেঁচাচ্ছেন, অ্যাবিকে ডাকছেন সাহায্য করার জন্য।

অ্যাবি অজানা আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে ছুটল। দেখল মা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছেন। নগ্ন পায়ে, এখনো ঘুম কাটেনি চোখ থেকে, মার পিছু পিছু নামতে লাগল সে। খিড়কির দরজা খুলে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এল।

ঠাসঠুস শব্দটা নরম, আর পেলব। গন্ধটা অ্যাবিকে সামার ক্যাম্পের কথা মনে করিয়ে দিল। তবে কাঠের তক্তায় আগুনের লেলিহান শিখার চুম্বনের দৃশ্যটাতে স্বস্তিদায়ক কিছু নেই। দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাবি, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ, পরমুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আগাছা ভরা উঠোন পেরিয়ে মার সঙ্গে ছুটল জ্বলন্ত গাছ বাড়ির দিকে, যেখানে ঘুমিয়ে আছে লিন্ডসে।

লিন্ডসের কাছে অ্যাবির তৃতীয় স্বপ্নের বাস্তবতা ছিল যন্ত্রণাদায়ক, তার কাঁধ, পিঠ এবং হাত পুড়ে যাওয়ার তীব্র বেদনার অনুভূতি। ডিয়ানা কেঁদে ফেললেন শুনে যখন ডাক্তাররা লিন্ডসেকে ভাগ্যবতী বলে ঘোষণা করলেন

ফার্স্ট ডিগ্রী বার্নের মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে খুব একটা ফিরে আসে না। কিন্তু বেঁচে গেছে লিন্ডসে।

আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হলো জানে না কেউ। রাস্তার ধার ঘেঁষা গাছ বাড়িতে, ধারণা করলেন ডিয়ানা, কোনো গর্দভ নিশ্চয়ই গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় জ্বলন্ত দেশলাই ছুঁড়ে মেরেছিল।

তবে অ্যাবি আরও ভালো জানে, কারণ দৃশ্যটা দেখেছে সে স্বপ্নে। মার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার আগে সে স্বপ্নে দেশলাইটাকে দেখেছে। তবে গাড়ি থেকে কেউ জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে মারেনি, একটা নরম, সাদা হাত দেশলাই বাক্স থেকে কাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে গাছ বাড়িতে।

হাসপাতালের রুমে লিন্ডসের সঙ্গে শুয়ে আছে অ্যাবি, মা চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছেন, প্রাণপণে কান্না ঠেকানোর চেষ্টা করল। পারল না। কাধ জোড়া নড়তে লাগল কান্নার দমকে, তবে নিঃশব্দে কাঁদল অ্যাবি। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল ও, হাতজোড়া মুখের সামনে ধরল। বাবার মতো ছোটো, চওড়া হাত তার, নখের ডগা চারকোণা। স্বপ্নের হাতের মতো মোটেই ফ্যাকাসে, নরম এবং ভয়ঙ্কর দেখতে নয়। তাহলে কার হাত দেখেছে সে স্বপ্নে?

.

আরও একটা সপ্তাহ গেল। এই এক সপ্তাহে ভৌতিক হাতটাকে স্বপ্নে দেখেনি অ্যাবি। গত সাতদিনে তাপমাত্রা নেমে গেল আরও, ঝরা পাতার স্তূপ জমে উঠল গাছের নিচে। লিন্ডসের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। তবে সে আর উঠোনের ধারে কাছেও গেল না, আরেকটা গাছবাড়ির কথা মুখেও আনল না। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না, যদিও সে রাতের ভয়াল স্মৃতি ভুলতে পারেনি কেউ। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে লিন্ডসে।

অ্যাবি প্রতি রাতে বিছানায় যায় আতঙ্ক নিয়ে। সারাদিন ভয়ে অস্থির থাকে রাতে কী স্বপ্ন দেখতে হবে তা ভেবে। জানে আবার স্বপ্ন দেখবে সে, কী ঘটবে তা নিয়ে প্রচণ্ড শঙ্কার মধ্যে আছে ও। মার্ক হেলপার্ন সেদিন স্কুল ছুটির পরে ওকে কোক কিনে দিল। কিন্তু তীব্র দুশ্চিন্তায় কাহিল ও বিপর্যস্ত অ্যাবির মাথায় এখন অন্য কিছু নেই। তাই মার্ক যখন ওকে নিয়ে শনিবার রাতে বাইরে যাওয়ার প্রস্তাব দিল, চমকে গেল অ্যাবি।

সাড়ে সাতটার দিকে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব আমি, শেষ বিকেলের রোদ গায়ে মেখে অ্যাবিদের বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা। ঘন সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে অ্যাবির দিকে তাকিয়ে হাসল মার্ক। ছবি দেখব। তারপর কিছু খাব। বেশ হবে, না?

অ্যাবিও জবাবে বেশ হবে বলতে যাচ্ছিল, লিন্ডসেকে দেখে আর বলা হলো না। সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে সে, এক হাতে পুতুলটার একটা ঠ্যাং ধরে আছে। এটা মেঝেতে পড়ে ছিল, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল সে।তোমার ঘরে যাচ্ছিলাম। দেখি মেঝের ওপর পড়ে আছে এটা।

ওর হাত থেকে পুতুলটা নিল অ্যাবি, স্যাটিনের স্কার্ট টেনেটুনে ঠিক করল। তুই শেলফে তুলে রাখলেই পারতি।

তোমাদের গলা শুনে ভাবলাম দেখি তো কে এসেছে, বলল লিন্ডসে, তাই আর ওটাকে শেলফে তুলে রাখতে মনে ছিল না। মার্কের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল সে, ঢুকে গেল ঘরে।

তুমি পুতুল খেলো নাকি? জিজ্ঞেস করল মার্ক।

মৃদু হাসল অ্যাবি। এটাকে চিলেকোঠার ঘরে পেয়েছি। অনেক পুরোনো পুতুল।

মার্ক ওর হাত থেকে পুতুলটা নিল। উল্টেপাল্টে দেখল। সুন্দর, মন্তব্য করল সে। চোখ তুলে চাইল অ্যাবির দিকে। তবে তোমার মতো সুন্দর নয়। মুচকি হাসল মার্ক প্রশংসাটা খুবই গতানুগতিক ঢঙের হয়ে গেছে বুঝতে পেরে। ঝুঁকে এল সে, ঠোঁট ছোঁয়াল অ্যাবির গোলাপি অধরে।

চুম্বনটা অ্যাবির কাছে বেমানান ঠেকল, দুজনের মাঝখানে পুতুলটা প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে বলে। তাছাড়া সে এত বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারল না। অবশ্য তাতে কিছু এল গেল না। মার্ক আবার হাসল অ্যাবির দিকে তাকিয়ে, পুতুলটা ওর হাতে দিয়ে পা বাড়াল নিজের গাড়ির দিকে।

টমেটোর মতো লাল রঙের গাড়িতে উঠে বসল লম্বা পা জোড়া ভাঁজ করে, একবার হর্ন বাজাল, তারপর চলে গেল। অ্যাবি ঘরে ঢোকার আগে পুতুলটাকে বুকে চেপে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

শুক্রবার রাতে আবার স্বপ্ন দেখল সে।

মাঝ রাতে জেগে গেল অ্যাবি, চাদরে মুড়ে আছে পা, কানে ধাক্কা দিচ্ছে। রক্ত স্রোত। বিপদের উপলব্ধি এমন তীব্র, সারারাত আর ঘুমাতে পারল না মেয়েটা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ভোরের অপেক্ষায় থাকল। একসময় দেখল রান্নাঘরের জানালা দিয়ে সূর্যের প্রথম আলো ঢুকছে।

অ্যাবি আবার সেই হাতজোড়াকে দেখেছে। তবে এবারে শুধু হাত নয়, গোটা শরীর। ছোটোখাটো কাঠামো, শিশুদের মতো। ছায়ার মধ্যে ছিল শরীরটা, পরিষ্কার বোঝা যায়নি চেহারা। শুধু নরম হাত আর বিবর্ণ গালের রেখা দেখতে পেয়েছে অ্যাবি। ওটা নড়াচড়া

করছিল, হাঁটছিল। অ্যাবি রাস্তার নুড়ি পাথরের শব্দ শুনেছে, ফিটফাট একটা পোশাক দেখেছে এক ঝলক, চকচকে কালো জুতোর ডগাও চোখে পড়েছে। তারপর একটা শব্দ কানে এসেছে, শ্বাস পড়ার শব্দ, বাচ্চাটা হেঁটে যাচ্ছে, পেছনে নরম ও উত্তেজিত খিকখিক একটা হাসির আওয়াজ হচ্ছিল।

তারপর রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করে শিশুর মতো কাঠামোটা, পায়ের ধাক্কায় ছিটকে যাচ্ছিল নুড়ি পাথর, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছিল। অ্যাবি টের পেয়েছে তারও শ্বাসের গতি দ্রুত হয়ে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল না কী ঘটছে, তবে খারাপ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে উপলব্ধি করতে পারছিল। তবে খারাপ ব্যাপারটা কতটুকু খারাপ, তা জানা ছিল না তার। অ্যাবি হঠাৎই দেখতে পায় হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো একজোড়া আলো, ইঞ্জিনের গুঞ্জন হঠাৎ পরিণত হয় গর্জনে, গাড়িটা ক্রমে কাছিয়ে আসতে থাকে, অ্যাবি দেখে ছোটো, ছায়াময় শরীরটা ইচ্ছে করে গাড়ি আসার রাস্তায় উঠে এসেছে।

তারপর ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ ক্রিইইইচ আওয়াজ, সেই সাথে ধাতব আর কাঁচ ভাঙার গা গোলানো শব্দ। এক মুহূর্ত নিরবতা, তারপর জেগে ওঠার আগে শেষ শব্দটা শুনতে পেয়েছে অ্যাবি–নরম, খিকখিক হাসি।

আজ শনিবার। কখন মার্কের সঙ্গে দেখা হবে তার অপেক্ষার প্রহর গুণবে যে মেয়ে সে তা না করে ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা মনে করে সিঁটিয়ে রইল সারাদিন। স্বপ্নটা তার মস্তিষ্কে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে রইল।

আইরিন ভাগ্যবতী সিঁড়ি দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙতে পারত তার। হলিরও ভাগ্য ভালো। ভাঙা কাঁচের টুকরা ওর চোখ কিংবা ঘাড়ে ঢুকে যেতে পারত। অন্ধ হয়ে যেত হলি, মৃত্যুও অস্বাভাবিক ছিল না। আগুনে পুড়ে মরে যেতে পারত লিন্ডসেও, গাছ বাড়ির মতো পুড়ে কয়লা হয়ে যেত সে।

এবারে চতুর্থ স্বপ্ন। কাল খবরের কাগজে কি কোনো দুর্ঘটনার খবর পড়তে হবে অ্যাবিকে? পড়তে হবে সেই খবর যা সে ইতিমধ্যে জানে–গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কেউ আহত হয়েছে, সম্ভবত কোনো শিশু?

ক্লান্ত ও খিটখিটে মেজাজ নিয়ে সারাদিন এ ঘর ও ঘর করে বেড়াল অ্যাবি, জানালা দিয়ে মা আর লিন্ডসেকে দেখল। ওরা পাতা পরিষ্কার করছে। আজ সকালে কুয়াশা পড়েছে। শীঘ্রি ঘাসের রঙ বিবর্ণ ও ম্লান হয়ে উঠবে। সমস্ত পাতা ঝরে কঙ্কাল হয়ে যাবে গাছগুলো, সাঁঝ নেমে আসবে আরও দ্রুত।

সাতটার সময় গোসল করল অ্যাবি, শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিল চুল। গরম জলের ছোঁয়ায় আড়ষ্ট পেশীগুলোয় ঢিল পড়ল, ভার ভার মাথাটাও অনেকটা হালকা লাগল। মোটা তোয়ালেতে শরীর মুড়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল অ্যাবি।

ক্লজিটের উপরে চোখ ঘুরছে অ্যাবির, শার্ট, স্কার্ট এবং প্যান্ট দেখছে, পছন্দ হচ্ছে না কোনোটাই। এমন সময় শব্দটা শুনতে পেল সে... সেই খিকখিক হাসি। এত পরিষ্কার, এত কাছে, চরকির মতো ঘুরল অ্যাবি, আশা করল পেছনে দেখতে পাবে কাউকে।

কিন্তু ঘর খালি।

মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি, যেন দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলছে। ফিরল ক্লজিটের দিকে। গাঢ় কমলা রঙের একটা ব্লাউজ পছন্দ হলো, নরম এবং মখমলের মতো মসৃণ। হাতঘড়ির দিকে নজর গেল ওর। আটটা বাজে। মার্কের আধঘণ্টা দেরি।

এক ঘণ্টা পরে কর্ডলেস ফোনটা নিজের ঘরে নিয়ে এল অ্যাবি, ফোন করল মার্কের বাসায়। বুক ধুকপুক করছে, ডায়াল করার সময় হাত কাঁপল। ভয়াবহ কিছু একটা ঘটে গেছে, কুডাক ডাকছে মন। মার্কের মা ফোন ধরলেন। অ্যাবি মার্ককে চাইল এবং অপর প্রান্ত থেকে ফোঁপানির আওয়াজ শুনে জমে বরফ হয়ে গেল।

মার্কের মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন মারা গেছে তার ছেলে, বিকেলবেলা, হাসপাতালে।

এক বন্ধুর বাসা থেকে ফিরছিল ও, জানালেন মিসেস হেলপার্ন। মার্ক খুব ভালো ড্রাইভার, অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি চালাত। কিন্তু নিশ্চয়ই গাড়িটা আচমকা ঘুরিয়ে ফেলতে হয়েছিল ওকে... বিরতি দিলেন তিনি এক মুহূর্তের জন্য, অ্যাবি শুনল ভদ্রমহিলা

ফোঁপাচ্ছেন। পঁয়ত্রিশ মাইল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল ও, ওখানকার স্পীড লিমিট তাই ছিল। কিন্তু পুলিশ বলেছে ওই গতিতে গাড়ি চালালেও যদি গাছে টাছে ধাক্কা লাগে...। আবার থেমে গেলেন তিনি।

অ্যাবির মুখের ভিতরটা শুকিয়ে খটখটে, কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল কণ্ঠস্বর। কেন? জিজ্ঞেস করল ও। আপনি বললেন ওকে আচমকা গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হয়েছিল। কিন্তু কেন?

বাচ্চা মেয়েটার জন্য, জবাব দিলেন মিসেস হেলপার্ন। ওরা ওকে অ্যাম্বুলেন্সে নেয়ার সময় মার্ক বলেছে একটা ছোটো মেয়েকে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসতে দেখে সে। পরিষ্কার নাকি দেখেছে। পুলিশ মেয়েটাকে অনেক খুঁজেছে। সন্ধান পায়নি।

গলা একেবারে ভেঙে গেল ভদ্রমহিলার, কোনো মতে বিদায় বলে নামিয়ে রাখলেন ফোন।

চোখ বুজল অ্যাবি। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। দাঁড়িয়ে আছে ও। জানে না বসলে যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে। কিন্তু নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই গায়ে, দাঁড়িয়েই রইল। মাথা ঘুরছে, টের পেল শরীরও দুলছে।

ঠিক তখন খিকখিক হাসিটা আবার শুনতে পেল অ্যাবি। শ্বাস চেপে রাখল ও, জানে আবার শুনবে শব্দটা। আবার শুনতে পেল ভৌতিক, ফিসফিসে খিকখিক হাসির শব্দ, ঘরের মধ্যে ভাসতে ভাসতে যেন এগিয়ে গেল ওর কাছে। ধীর গতিতে ঘুরল অ্যাবি, চোখ মেলল, দৃষ্টি স্থির হলো পুতুলটার চকচকে আকাশ-নীল চোখে।

একটি ছোটো মেয়ে।

বেগুনি রঙের পোশাক পরা একটি ছোটো মেয়ে, নরম, বিবর্ণ হাত, পায়ে চকচকে কালো জুতা। অ্যাবি চিলেকোঠার ময়লা ঘেঁটে যে পুতুলটাকে খুঁজে এনেছ অবিকল তার মতো... ওকে কি জ্যান্ত করেছে সে? এমনই জ্যান্ত যে ধাক্কা মেরে অ্যাবির এক বান্ধবীকে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিতে পারে... আরেক বান্ধবীর মাথায় ভাঙতে পারে বাতি, দেশলাই কাঠিতে আগুন ধরিয়ে গাছ বাড়ি ধ্বংস করে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে পারে তার বোনকে?

এ পুতুলের এমনই শক্তি যে কি না রাস্তায় গিয়ে ষোলো বছরের এক নিষ্পাপ তরুণকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে?

দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবি, মহা আতঙ্কে লক্ষ করল পুতুলটার চাউনিতে পরিবর্তন ঘটেছে, সত্যি সত্যি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে চোখজোড়া, সোজা তাকাল অ্যাবির দিকে। দৃষ্টিতে প্রকট বিজয় উল্লাস। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য ওভাবে তাকিয়ে থাকল পুতুল। কিন্তু ওই সময়টুকুই যথেষ্ট। ওর ভিতরে জীবন আছে, এক ধরনের জীবন, এক ধরনের ভয়ঙ্কর

শক্তি যে শক্তি মানুষ হত্যা করে এবং যাকে না থামানো পর্যন্ত আরও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবে।

অ্যাবি জানে এখন ওর করণীয় কী। গলা দিয়ে ঠেলে আসা চিৎকারটা গিলে ফেলল, লম্বা পা ফেলে দাঁড়াল শেলফের সামনে, এক টানে তাক থেকে নামিয়ে আনল পুতুলটাকে। ওর ভিতরে জীবন থাকলেও আর দেখতে চায় না অ্যাবি। সে ওটাকে সুন্দর কাঠের বাক্সটিতে ঢোকাল। তারপর ঢাকনি ফেলে চকমকে ছিটকিনি আটকে দিল।

এখন এটাকে কফিনের মতো লাগছে।

সাটিনের ঝালর দেয়া পুতুলের জন্য কফিন।

দশ মিনিট পরে মার গাড়িটা নিয়ে পাহাড়ি রাস্তার মাথায় চলে এল অ্যাবি। বাক্সটা ওর পাশের সীটে পড়ে আছে। ওটার দিকে হাত বাড়াল অ্যাবি, একটা শব্দ শুনতে পেল। অস্পষ্ট, টুপটুপ শব্দ, যেন নুড়ি পাথরের গায়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। তবে ওটা নুড়ি পাথর নয়।

ছোটো মুঠি দিয়ে ঘুসি মারছে কাঠের গায়ে।

গাড়ি থেকে বের হলো অ্যাবি, শোঁ শোঁ বাতাসে চুল উড়ছে। বাক্সটা হাতে নিয়ে পাহাড়চুড়োর কিনারে এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাক্সটাকে ছুঁড়ে মারল অ্যাবি। দেখল ওটা ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে নেমে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় বারকয়েক ঝিকিয়ে উঠল পিতল, শেষে নিচের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

পাহাড়চূড়ায় একা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অ্যাবি। হিমেল বাতাসে কাঁপুনি ধরে গেছে শরীরে, কিন্তু ও অপেক্ষা করল। নিশ্চিত হতে চায়। কান খাড়া করে রেখেছে অ্যাবি। অবশেষে ভোঁতা তবে পরিষ্কার শব্দটা শোনা গেল। পাহাড়ের নিচে, ধারাল চাঁইয়ের সাথে বাড়ি খেয়েছে বাক্স। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর নেমে এল নিস্তব্ধতা।

ঝামেলা শেষ। পুতুলটা বিদায় হয়েছে, অ্যাবি বাড়ির পথ ধরল। জানে এবার থেকে সে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে, ওই বিবর্ণ, ভয়ঙ্কর হাতজোড়া আর স্বপ্নে তাড়া করে ফিরবে না ওকে।

.

লোকটা অবশেষে খুলে ফেলল বাক্সের ছিটকিনি। উঁকি দিল ভেতরে। হাসি ফুটল মুখে। সে অবাক হয়েছে, খুশিও। সে নিশ্চিত এটা সত্যিকারের কোনো অ্যান্টিক, অনেক দামি।

হাতজোড়া আর মুখখানা চমৎকার চীনামাটি দিয়ে তৈরি, পোশাকটা অবশ্যই খাঁটি স্যাটিনের। আজকাল এরকম পুতুল কেউ বানায় না।

অ্যান্টিক হোক বা না হোক, সিদ্ধান্ত নিল লোকটা, এটাকে বিক্রি করবে। তার নয় বছরের একটি মেয়ে আছে, পুতুলের জন্য পাগল। মেয়েকে এই চমৎকার জিনিসটি উপহার দেবে সে। পরিতৃপ্তির হাসি ঠোঁটে, বাক্সটা বগলে চেপে বাড়ির পথ ধরল লোকটা।

# ভয়াল রাত

অনেক অনেক দিন আগে জাপানের ছোটো একটি গাঁয়ে বাস করত এক গরিব চাষি ও তার বউ। তারা দুজনই ছিল বেজায় ভালোমানুষ। তাদের অনেকগুলো বাচ্চা। ফলে এতগুলো মানুষের ভরণপোষণ করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠে যেত চাষার। বড় ছেলেটির বয়স যখন চোদ্দ, গায়ে-গতরে বেশ বলিষ্ঠ, সে বাবাকে কৃষি কাজে সাহায্য করতে নেমে পড়ল। আর ছোটো মেয়েগুলো হাঁটতে শেখার পরপরই মাকে ঘরকন্নার কাজে সহযোগিতা করতে লাগল।

তবে চাষী-দম্পতির সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি কোনও শক্ত কাজ করতে পারত না। তার মাথায় ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি–সে তার সবগুলো ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে চালাক ছিল। কিন্তু খুব দুর্বল শরীর এবং দেখতে নিতান্তই ছোটোখাটো ছিল বলে লোকে বলত ওকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। কোনও কাজেই লাগবে না সে। বাবা-মা ভাবল কৃষিকাজের মতো কাজ করা যেহেতু ছোটো ছেলের পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই ওকে পুরোহিতের কাজে লাগিয়ে দেয়া যাক। বাবা-মা একদিন ছোটো ছেলেকে নিয়ে গায়ের মন্দিরে চলে এল। বুড়ো পুরোহিতকে অনুনয় করল, তিনি যেন তাদের ছেলেটিকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ওকে পড়ালেখা শেখান। যাতে বড়ো হয়ে সে মন্দিরে যজমানি (পুরোহিতগিরি) করতে পারে।

বৃদ্ধ ছোটো ছেলেটির সঙ্গে সদয় আচরণ করলেন। তাকে কিছু কঠিন প্রশ্ন করা হলো। ছেলেটি এমন চতুর জবাব দিল যে তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে কোনওই আপত্তি করলেন না ধর্মগুরু। তিনি ওকে মন্দিরের টোলে ভর্তি করে দিলেন। ওখানে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হতো।

বৃদ্ধ পুরোহিত ছেলেটিকে যা শেখালেন, সবকিছু দ্রুত শিখে নিল সে। সে গুরুর অত্যন্ত বাধ্যগত ছাত্র। তবে তার একটা দোষ ছিল। সে পড়ার সময় ছবি আঁকত। এবং তার ছবির বিষয়বস্তু ছিল বেড়াল। ওই সময় মন্দিরে বেড়ালের ছবি আঁকার ব্যাপারে নিষেধ ছিল।

একা যখন থাকত ছেলেটি, তখনই এঁকে ফেলত বেড়ালের ছবি। সে ধর্মগুরুর ধর্মীয় বইয়ের মার্জিনে ছবি আঁকত, মন্দিরের সমস্ত পর্দা, দেয়াল এবং পিলারগুলো ভরে গিয়েছিল বেড়ালের ছবিতে। পুরোহিত বহুবার তাকে এসব ছবি আঁকতে মানা করেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটি ছবি আঁকত কারণ না এঁকে পারত না। ছবি না আঁকলে কেমন অস্থির লাগত তার। সে ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন চিত্রকর। ছবি এঁকেই একদিন নাম কামানোর স্বপ্ন দেখত ছেলেটি। এ জন্য ধর্ম শিক্ষায় মন দিতে পারত না। ভালো ছাত্র হওয়ার খায়েশও তার ছিল না। ভালো ছাত্র হতে হলে বই পড়তে হয়। কিন্তু পড়ার চেয়ে আঁকাআঁকিই তাকে টানত বেশি।

একদিন এক দেবতার পোশাকে বেড়ালের ছবি আঁকতে গিয়ে ধর্মগুরুর কাছে হাতেনাতে ধরা খেল ছেলেটি। বুড়ো খুবই রেগে গেলেন। বললেন, তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও। তুমি কোনোদিনও পুরোহিত হতে পারবে না। তবে চেষ্টা করলে একদিন হয়তো বড়ো মাপের চিত্রকর হতে পারবে। তোমাকে শেষ একটি উপদেশ দিই শোনো। উপদেশটি কখনও ভুলো না। রাতের বেলা বড়ো জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোটো জায়গায়!

গুরুর এ কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না ছেলেটি। এ কথার মানে ভাবতে ভাবতে সে তার ছোটো বোঁচকা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মন্দির থেকে। গুরুকে তাঁর কথার অর্থ জিজ্ঞেস করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ধমক খাওয়ার ভয়ে প্রশ্ন করল না। শুধু বিদায় বলতে পারল।

মনে দুঃখ নিয়ে মন্দির ছেড়েছে ছেলেটি। কোথায় যাবে, কী করবে বুঝতে পারছে না। যদি বাড়ি যায়, পুরোহিতের কথা না শোনার অভিযোগে বাবা ওকে বেদম পিটুনি দেবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই বাড়ি যাওয়ার চিন্তা নাকচ করে দিল সে। হঠাৎ বাড়ির পাশের গায়ের কথা মনে পড়ল। এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে। ওই গাঁয়ে বিশাল একটি মন্দির আছে। মন্দিরে তরুণ-বুড়ো অনেক পুরোহিত আছেন। ছেলেটি শুনেছে ওখানেও একটি টোল আছে। সেখানে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয়। সে ঠিক করল ওই গাঁয়ে যাবে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হাতে-পায়ে ধরে বসবে তাকে টোলে ভর্তি করানোর জন্য। ওর কাতর অনুরোধ নিশ্চয় ফেলতে পারবেন না ঠাকুর মশাই।

কিন্তু ছেলেটি জানত না বড়ো মন্দিরটি বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানে একটা পিশাচ এসে আস্তানা গেড়েছে। পিশাচের ভয়ে পুরোহিতরা অনেক আগেই মন্দির ছেড়ে পালিয়েছেন। গাঁয়ের কজন সাহসী মানুষ পিশাচটাকে মারতে গিয়েছিল। তারা এক রাতে ছিল ওই মন্দিরে। কিন্তু পরদিন কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি। তাদের রক্তাক্ত, খাবলানো শরীর পড়ে ছিল মন্দিরের চাতালে। তারপর থেকে ভুলেও কেউ ওই মন্দিরের ছায়া মাড়ায় ্না। পরিত্যক্ত মন্দিরটি এখন হানাবাড়িতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব কথা তো আর ছেলেটি জানত না। সে মন্দিরের টোলে ভর্তি হওয়ার আশায় পথ চলতে লাগল।

চার ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে গায়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা নেমে এল। গ্রামের মানুষ এমনিতেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, মন্দিরে পিশাচের হামলা হওয়ার পর থেকে তারা সূর্য পশ্চিমে ডুব না দিতেই ঘরের দরজা এঁটে, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। আর মন্দির থেকে ভেসে আসা বিকট, বীভৎস সব চিৎকার শুনে শিউরে শিউরে ওঠে।

মন্দিরটি গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, একটি টিলার ওপরে। ছেলেটি মন্দিরে আলো জ্বলতে দেখল। ভূতুড়ে মন্দিরে কেউ পুজো দিতেই যায় না, আলো জ্বালা দূরে থাক। তবে লোকে বলে পিশাচটা নাকি সাঁঝবেলা আলো জ্বেলে রাখে পথ ভোলা পথচারীদের আকৃষ্ট করার জন্য। আলোর হাতছানিতে দূর গাঁ থেকে আসা মুসাফির আশ্রয়ের খোঁজে মন্দিরে ঢুকলেই পিশাচের শিকার হয়।

ছেলেটি মন্দিরের বিশাল, কারুকাজ করা পুরু কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াল। আঙুলের গাঁট দিয়ে টুক টুক শব্দ করল। কেউ সাড়া দিল না। আবার নক্ করল সে। জবাব নেই। মন্দিরের সবাই এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! অবাক হয় ছেলেটি। একটু ইতস্তত করে দরজায় ধাক্কা দিল সে। ক্যাআআচ শব্দে মেলে গেল কপাট। ভেতরে ঢুকল ছেলেটি। মাটির একটি প্রদীপ জ্বলছে কেবল। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছেলেটি ভাবল কেউ না কেউ নিশ্চয় আসবে। সে মেঝেতে বসে পড়ল। অপেক্ষা করছে। ছেলেটি লক্ষ করল মন্দিরের সব কিছুই ধুলোয় ধূসর হয়ে আছে। মাকড়সার জালে ছেয়ে গেছে প্রায় পুরোটা জায়গা। বোঝাই যায় অনেক দিন ঝাঁটা পড়েনি। হয়তো ঝাঁটা দেয়ার লোক নেই। ছেলেটি মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠল তাকে ঠাকুর মশাই শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন ভেবে। কারণ ঘর ঝাঁট দেয়ার জন্য হলেও তো ওদের একজন লোক লাগবে।

জানালায় বড়ো বড়ো পর্দা ঝুলতে দেখে খুশি হয়ে গেল ছেলেটি। বাহ, ছবি আঁকার চমৎকার ক্যানভাস পাওয়া গেছে। রঙ পেন্সিলের বাক্স সে সঙ্গেই নিয়ে এসেছে। দ্বিরুক্তি না করে বেড়ালের ছবি আঁকতে বসে গেল।

পর্দাগুলো ভরে ফেলল সে বড়ো বড়ো বেড়ালের ছবিতে। পথ চলার ক্লান্তিতে তার ঘুম এসে গেল। সে পুঁটুলি খুলে চাদর বিছিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়ার তোড়জোর করছিল,

এমন সময় মনে পড়ে গেল ধর্মগুরুর কথা–রাতের বেলা বড়ো জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোটো জায়গায়!

মন্দিরটি প্রকান্ড; আর সে একা। গুরুর কথাগুলো মনে পড়তে, অর্থ না। বুঝলেও, এবার তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে ঘুমাবার জন্য ছোটো ঘর খুঁজতে লাগল। ক্ষুদ্র একটি কুঠুরিও পেয়ে গেল। কুঠুরির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তারপর ছিটকিনি লাগিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল।

গভীর রাতে ভয়ঙ্কর একটা শব্দে জেগে গেল সে। মারামারি করছে কারা যেন। ফ্যাঁচফ্যাঁচ, অপার্থিব আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জান্তব চিৎকার। এমন ভয় পেল ছেলেটি, দরজার ফাঁক দিয়েও মন্দিরের ভেতরে তাকাতে সাহস পেল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল তাকালেই এমন ভয়াবহ কিছু একটা সে দেখবে যে হার্টফেল হয়ে যাবে। সে মেঝেতে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল। নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে।

আলোর যে সূক্ষ্ম রেখা ঢুকছিল দরজার ছিলকা দিয়ে তা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেটি বুঝতে পারল নিভে গেছে মন্দিরের বাতি। নিকষ আঁধারে ডুবে গেল ঘর। তবে ভীতিকর শব্দগুলো চলল বিরতিহীন। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের আওয়াজ, রক্ত হিম করা গলায় কে যেন আর্তনাদ করে উঠছে মাঝে মঝে। গোটা মন্দির থরথর করে কাঁপছে। বোঝা যাচ্ছে দরজার বাইরে মরণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠেছে দুটি পক্ষ। অনেকক্ষণ পরে নেমে এল

নীরবতা। কিন্তু ছেলেটি ভয়ে নড়ল না এক চুল। অবশেষে ভোর হলো। সোনালি আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

লুকানো জায়গা থেকে খুব সাবধানে বেরিয়ে এল ছেলেটি। তাকাল চারদিকে। দেখল মন্দিরের মেঝেতে রক্ত আর রক্ত! রক্তের পুকুরের মাঝখানে মরে পড়ে আছে গরুর চেয়েও আকারে বড়ো একটি দৈত্যকার ইঁদুর। মন্দিরের পিশাচ!

কিন্তু এটাকে হত্যা করল কে? মানুষজন কিংবা অন্য কোনও প্রাণী দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ছেলেটি লক্ষ করল সে গতরাতে পর্দায় যে সব বেড়ালের ছবি এঁকেছে, সবগুলো বেড়ালের গায়ে রক্ত মাখা! সে তক্ষুনি বুঝতে পারল পিশাচ ইঁদুরটাকে তারই আঁকা বেড়ালরা হত্যা করেছে। এবং এখন সে বুঝতে পারল বৃদ্ধ পুরোহিতের সেই সাবধান বাণীর মানে-রাতের বেলা বড়ো জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোটো জায়গায়।

ওই ছেলেটি বড় হয়ে খুব বিখ্যাত চিত্রকর হয়েছিল। আর তার আঁকা বেড়ালের সেই ছবিগুলো এখনও ওই মন্দিরে আছে!

# ভুতুড়ে আংটি

মিস্টার জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ, এফ.আর.এস, থাকেন ১৪৭ গাউয়ার স্ট্রিটে। তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা আর কর্মশক্তি তাঁকে প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকদের দলে স্থান করে দিতে পারত। কিন্তু তিনি বিশ্বজনীন উচ্চাকাঙ্খর শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। ফলে কোনো এক বিষয়ে সেরা হওয়ার চাইতে নানা বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল।

প্রথম দিকে প্রাণিবিদ্যা আর উদ্ভিদ বিদ্যার দিকে তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। এই দুই বিষয়ে তিনি এমন ভাবে কাজ করেছিলেন যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দ্বিতীয় ডারউইন ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু যখন একটি অধ্যাপকের পদ প্রায় তার নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছে, তখনই তিনি এসব বিষয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে রসায়ন শাস্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন। এখানে তিনি ধাতুর বর্ণালীর ওপর গবেষণা করে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ অর্জন করেন।

কিন্তু এবারও তিনি একই কাজ করলেন। ল্যাবরেটরিতে এক বছর অনুপস্থিত থাকার পর মি. স্মিথ ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে যোগ দেন। এলকাব-এর হায়ারোগ্লিফিক এবং ডিমোটিক লিপি সম্পর্কে একটি মূল্যবান গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। আর এভাবেই মি. স্মিথ একদিকে যেমন বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিলেন, অন্যদিকে তেমনি দেখালেন তাঁর প্রতিভার অস্থিরতা।

এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এক সময় না এক সময় কিছু একটায় থিতু হয়। মি. স্মিথও তার ব্যতিক্রম নন। প্রাচীন মিশরতত্ত্ব মানে ঈজিপ্টোলজির যত গভীরে তিনি প্রবেশ করতে লাগলেন ততই তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। মানব সভ্যতার সূচনা যেখানে হয়েছিল তার ওপর গবেষণার মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কারের কী বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তা তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।

মিশরতত্ত্ব স্মিথকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি এক তরুণী মিশরতাত্ত্বিককে বিয়ে করে ফেললেন। এই তরুণী প্রাচীন মিশরের ষষ্ঠ রাজ বংশের ওপর মূল্যবান গবেষণা করেছিল।

গবেষণার ভিত্তি শক্ত তৈরি করে, মিস্টার স্মিথ গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রাচীন মিশর নিয়ে এমন কাজ করবেন যার মধ্যে সংযুক্ত হবে Lepious-এর গবেষণা আর Champolion-এর উদ্ভাবনী দক্ষতা। আর এই বিরাট ঐতিহাসিক কাজের জন্য স্মিথকে প্রায়ই ফ্রান্সে যেতে হতো। সেখানকার ল্যুভর জাদুঘরের প্রাচীন মিশরীয় সংগ্রহ খুবই সমৃদ্ধ। গত অক্টোবরের মাঝামাঝিতে তিনি শেষবার ভরে গিয়েছিলেন। সে সময় অদ্ভুত এক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

ট্রেনটা অনেক আস্তে চলছিল। আর ইংলিশ চ্যানেলের অবস্থাও ছিল খারাপ। তাই মি. স্মিথ প্যারিসে পৌঁছালেন কিছুটা বিভ্রান্ত এবং উত্তেজিত অবস্থায়। প্যারিসে পৌঁছে তিনি উঠলেন Rue Laffitte রাস্তার হোটেল দ্য ফ্রান্স-এ। হোটেল রুমে ঢুকে তিনি ক্লান্ত দেহটাকে সোফায় এলিয়ে দিলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক শুয়ে থেকেও ঘুম এল না। তাই স্মিথ সিদ্ধান্ত নিলেন এখনই ল্যুভর মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বেন। যে কারণে তিনি মিউজিয়ামে যাবেন তাতে বেশি সময় লাগবে না। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে, সন্ধ্যার ট্রেনেই তিনি দিয়েপ্পীতে (Dieppe) ফিরে যাবেন।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সোফা ছেড়ে উঠে ওভারকোট গায়ে দিলেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। Boulevard des Italiens এবং Avenue de POPera পার হয়ে তিনি ভরে পৌঁছালেন।

ভর তাঁর খুব পরিচিত জায়গা। মিউজিয়ামে পৌঁছেই তিনি যে ঘরে প্যাপিরাসের সংগ্রহ রয়েছে সেদিকে পা চালালেন।

জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথকে খুব একটা সুদর্শন বলা যাবে না। তবে তাঁর টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো নাক আর দৃঢ় চিবুক তাকে আর দশজন মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। দেহের ওপর মাথাটাকে তিনি পাখির কায়দায় ধরে রেখেছেন। আলাপ আলোচনা করার সময় তিনি পাখির ঠোকরানোর মতো ভঙ্গি করেন। আর এভাবেই কোনো বিষয়ে আপত্তি জানান, কারও কথার জবাব দেন।

প্যাপিরাসের সংগ্রহশালায় স্মিথ ঢুকলেন। তাঁর ওভারকোটের কলার উঁচু করে কান পর্যন্ত তোলা। সামনের ডিসপ্লে কেসের কাছে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভাবলেন, সত্যিই তিনি অন্যরকম। কিন্তু পেছন থেকে ইংরেজি ভাষায় পরিষ্কার করে বলা কথাগুলো শুনে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। পেছন থেকে তীক্ষ্ণ গলায় কেউ বলল, লোকটা দেখতে কী অদ্ভুত!

স্মিথের একটু বেশি পরিমাণেই অহমিকা বোধ আছে। পেছন থেকে মন্তব্য শুনে তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। তিনি কঠিন দৃষ্টিতে প্যাপিরাসের বান্ডিলগুলোর দিকে তাকালেন। সমস্ত ব্রিটিশ ভ্রমণকারীদের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁর মনটা তিক্ত হয়ে গেল।

হ্যাঁ, আরেকটা কণ্ঠ বলল, লোকটা সত্যিই অসাধারণ।

তুমি জানো, প্রথম বক্তা বলল, যে কেউই বিশ্বাস করবে মমির ব্যাপারে ক্রমাগত চিন্তা করতে থাকলে কোনো লোক নিজেই অর্ধেক মমি হয়ে যায়?

লোকটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে মিশরীয়, দ্বিতীয় বক্তা বলল।

জন স্মিথ ঘুরে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য, তার দেশের লোক দুটিকে কড়া কথা বলবেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গেলেন। পাশাপাশি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। দেখলেন লোকদুটো

তাকে নিয়ে মন্তব্য করছে না। বরং তারা তার দিকে পেছন ফিরে লুভর মিউজিয়ামের এক বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। অ্যাটেনডেন্ট রুমের অপর প্রান্তে বসে পিতলের তৈরি একটা জিনিস পালিশ করছিল।

কার্টার আমাদের জন্য প্যালেস রয়েল-এ অপেক্ষা করবে, একজন অপরজনকে বলল, ঘড়ির দিকে তাকাল। তারা চলে গেল। রুমের মধ্যে শুধু মাত্র মি. জন স্মিথ আর অপর প্রান্তে সেই অ্যাটেনডেন্ট।

বুঝলাম না ওরা কেননা বলল লোকটা দেখতে মিশরীয়দের মতে, স্মিথ ভাবতে লাগলেন। যে জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তাই স্মিথ একটু সরে দাঁড়ালেন। অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। মিশর নিয়ে গবেষণা করার সময় এধরনের চেহারার সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছে।

লোকটার আকৃতি পাথুরে মূর্তির মতো, কপাল চওড়া, গায়ের রং ঈষৎ কালচে। এরকম চেহারার অসংখ্য পাথরের মূর্তি, মমি কেস আর ছবি এই বিশাল রুমের দেয়ালগুলোতে সাজানো রয়েছে।

ঘটনাটা কাকতালীয় বলা যায় না। লোকটা অবশ্যই মিশরীয়। তার কাঁধের কৌণিক গড়ন এবং সরু নিতম্ব তাকে মিশরীয় হিসেবে পরিচিত করে।

অ্যাটেনডেন্টের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন স্মিথ। উদ্দেশ্য লোকটার সাথে কথা বলা। মানুষের সাথে কথা বলতে তিনি কখনো দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু এবারে একটু অপ্রস্তুত বোধ করছেন। কাছে এসে তিনি অ্যাটেনডেন্টের মুখের এক পাশ দেখতে পেলেন। কারণ এখনও সে একমনে পালিশ করে যাচ্ছে। স্মিথ স্থির দৃষ্টিতে লোকটার গায়ের চামড়ার রং দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো ওই চামড়ার মাঝে কেমন যেন এক অমানবীয় এবং অতিপ্রাকৃত ভাব রয়েছে। কপাল আর দুচোয়ালের চামড়া এমন চকচকে যেন বার্নিশ করা পার্চমেন্ট। কোনো লোমকূপের চিহ্নও নেই। এই শুষ্ক চামড়ায় একবিন্দু ঘামের কল্পনাও কেউ করতে পারবে না। কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের বাকি অংশ অসংখ্য সূক্ষ্ম বলি রেখায় ভরা। দেখে মনে হয় প্রকৃতি যেন মাউরি (Maori-নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী) মেজাজে ওই মুখের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছে যে কত জটিল নকশা সৃষ্টি করতে পারে সে।

মেমফিসের সংগ্রহগুলো কোথায়? স্মিথ জিজ্ঞাসা করলেন। আলাপ শুরু করার জন্যই প্রশ্নটা করেছেন।

ওইখানে, লোকটা রূঢ়ভাবে জবাব দিল, মাথা নেড়ে ঘরের অপর প্রান্ত দেখাল।

তুমি কি মিশরীয়? স্মিথ আবার প্রশ্ন করলেন। অ্যাটেনডেন্ট এবার তার অদ্ভুত কালো চোখ তুলে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো কাঁচের মতো চকচকে। তাতে

রয়েছে এক কুয়াশাচ্ছন্ন শুকনো ঔজ্জ্বল্য। কোনো মানুষের এরকম চোখ স্মিথ কখনও দেখেননি। অ্যাটেনডেন্টের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে দেখলেন, লোকটার চোখের গভীরে যেন আবেগ জমে উঠছে। যেটা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে ঘৃণা আর আতঙ্কে রূপ নিল।

না, মশিয়ে, আমি ফরাসি। একথা বলে লোকটা হঠাৎ ঘুরে বসে আবার পালিশে মন দিল।

স্মিথ অবাক হয়ে লোকটার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর হলের এক কোণে চেয়ারে বসলেন। জায়গাটা একটা দরজার পেছনে। চেয়ারে বসে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্যাপিরাসের পাতা থেকে নোট করতে শুরু করলেন। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারলেন না। বারবার স্ফিংসের মতো বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের চেহারা আর পার্চমেন্টের মতো তার চামড়ার কথা মনে পড়তে লাগল।

ওরকম চোখ কোথায় দেখেছি? স্মিথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন। চোখের দৃষ্টি অনেকটা সরীসৃপের মতো। সাপের চোখে যে ঝিল্লি আছে, হয়তো বুড়োর চোখেও তাই আছে। স্মিথ হাসলেন। প্রাণিবিদ্যার কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছে। ঝিল্লি আছে বলেই হয়তো তার চোখে চকচকে ভাব রয়েছে। কিন্তু ওখানে আরও কিছু রয়েছে। আমি পরিষ্কার দেখেছি শক্তি আর জ্ঞানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ওই দুই চোখে ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া আরও আছে চরম ক্লান্তি আর প্রচণ্ড হতাশা। হয়তো এসব আমার কল্পনা। কিন্তু প্রথম দর্শনে কেউ

আমার মনে এরকম ছাপ ফেলেনি। ঈশ্বর, লোকটাকে আরেকবার দেখতেই হবে। স্মিথ চেয়ার থেকে উঠে মিশরিয় সংগ্রহশালায় ঢুকলেন। কিন্তু যে লোক তাঁর কৌতূহল জাগিয়েছে, তাকে দেখতে পেলেন না।

স্মিথ আবারও সেই নির্জন কোনায় বসে নোট করতে লাগলেন। যে সমস্ত তথ্য তার দরকার সবগুলোই তিনি প্যাপিরাসে পেয়েছেন। মনে থাকতে থাকতে সেগুলো লিখে ফেলা দরকার। কিছুক্ষণ তার পেন্সিল কাগজের ওপর দ্রুত চলতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই লাইনগুলো আর এক রেখায় রইল না। শব্দগুলো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। অবশেষে পেন্সিলটা মেঝেতে পড়ে গেল। স্মিথের মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তির ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। নির্জন কোণে দরজার পেছনে তাঁর ঘুম এতটাই গম্ভীর হলো যে সিভিল গার্ডের চলাচলের শব্দ, দর্শকদের পদধ্বনি এমনকী মিউজিয়াম বন্ধ হওয়ার তীক্ষ্ণ, কর্কশ ঘণ্টা ধ্বনিও তার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গাঢ় হতে হতে রাতের ঘন অন্ধকারে পরিণত হলো।

Rue de Rivoli-র কর্মব্যস্ততার শব্দ বেড়ে উঠে একসময় তাও থেমে গেল। দূরে নটরডেম গীর্জায় মাঝরাতের ঘণ্টা বাজল। এখনও হলঘরের অন্ধকার কোণে স্মিথের ঘুমন্ত দেহটা এক নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তির মতো নিঃশব্দে বসে রইল।

.

রাত একটার দিকে মি. স্মিথের ঘুম ভাঙল। জেগে উঠে তিনি বড়ো করে শ্বাস নিলেন। এক মুহূর্তের জন্য ভাবলেন বাসায় স্টাডি রুমের চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পর্দাবিহীন জানালা দিয়ে চাঁদের আলো পরিপূর্ণভাবে ঘরে ঢুকছে। সেই আলোয় সারি সারি মমি আর পালিশ করা বাক্স দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তিনি কোথায় আছেন। কীভাবে এখানে রয়ে গেলেন তা বুঝতেও দেরি হলো না।

তবে মি. স্মিথ আতঙ্কিত হলেন না। নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে সে পরিবেশকে ভালোবাসা তার বংশের বৈশিষ্ট্য। তিনিও তার ব্যতিক্রম নন। হাত পায়ের খিল ভাঙাবার জন্য ছড়িয়ে বসে ঘড়ির দিকে তাকালেন। চাঁদের আলোয় সময় দেখে মুচকি হাসলেন। ভাবলেন, এই ঘটনা তার পরবর্তী গবেষণা বইয়ের জন্য একটি ছোটো অথচ চমৎকার কাহিনি হবে। কাটখোট্টা বিষয় পড়তে পড়তে পাঠক কিছুটা স্বস্তি পাবে।

একটু ঠান্ডা লাগছে। তবে স্মিথ পুরোপুরি জেগে আছেন। এখন বুঝতে পারছেন গার্ডরা কেন তাঁকে দেখতে পায়নি। যে দরজার আড়ালে তিনি ছিলেন সেটার কালো ছায়ায় তিনি পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন।

চারদিকে এই সুনসান নিস্তব্ধতা ভারি চমৎকার। বাইরে বা ভেতরে কোথাও একটু শব্দ, এমনকী একটু মর্মর ধ্বনি পর্যন্ত নেই। এক মৃত সভ্যতার মৃত মানুষদের সাথে তিনি একা রয়েছেন। এই ঘরের বাইরে রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর ভাপসা আবহাওয়া, কিন্তু

তাতে কী! এ হলঘরে যে সব প্রাচীন বস্তু রয়েছে–গমের শুকনো মঞ্জুরী থেকে চিত্রশিল্পীর রঙের বাক্স পর্যন্ত-সবগুলো সুদীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে মহাকালের সাথে লড়াই করে আজও টিকে রয়েছে। সুদূর অতীতের সাম্রাজ্য থেকে সময়ের স্রোতে ভেসে আসা কত জিনিস এখানে আছে। থিবিস, লুক্সর (Luxor) এমনকী হেলিও পোলিশের বিশাল মন্দিরগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে বিভিন্ন নিদর্শন এখানে এসেছে। তা ছাড়া কয়েকশো সমাধি খনন করে সংগ্রহ করা বিপুল প্রাচীন দ্রব্য এখানে আনা হয়েছে।

স্মিথ নিস্তব্ধ মূর্তিগুলোর দিকে তাকালেন। আলো আঁধারিতে দেখে মনে হচ্ছে মূর্তিগুলো কাঁপছে। একদা ব্যস্ত, কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলো এখন চির বিশ্রামে শায়িত আছে। এসব ভাবতে ভাবতে স্মিথের মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। নিজের যৌবন আর তুচ্ছতা সম্পর্কে এক ভিন্ন ধারণা যেন পেয়ে বসল তাঁকে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে স্বপ্নীল দৃষ্টিতে সংগ্রহশালার দিকে তাকালেন। চাঁদের আলোতে সব কিছু যেন রুপালি হয়ে উঠেছে। সংগ্রহগুলোর মাঝখানে দর্শক চলাচলের সরু পথটা বিরাট হলের শেষ প্রান্তে চলে গেছে।

হঠাৎ তিনি সেই পথে একটা আলো দেখতে পেলেন। আলোটা ক্রমশ কাছিয়ে আসছে।

স্মিথ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। উত্তেজনায় তার স্নায়ু টান টান। আলোটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে থেমে এগুচ্ছে। আলো বহনকারী নিঃশব্দে এগোচ্ছে। তারপরও তার পায়ের টিপটিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

স্মিথ ভাবলেন মিউজিয়ামে হয়তো চোর ঢুকেছে। তাই তিনি আরও অন্ধকার কোণে সরে গেলেন। আলোটা এখনও দুই রুম দূরে। এবার পাশের রুমে আসল। এখনও কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ করেই বাতির আলোটার পেছনে একখানা মুখ দেখা গেল। মুখের অধিকারীর দেহটা ছায়ায় মোড়ানো। আলোটা মুখের ওপর এমনভাবে পড়েছে, মনে হচ্ছে মুখটা যেন বাতাসে ভাসছে। এই মুখের ওপর চকচকে চোখ দুটো আর কর্কশ চামড়া দেখে ভুল হওয়ার কোনো উপায় নেই। গভীর রাতের রহস্যময় আগন্তুক আর কেউ নয়, সেই অ্যাটেনডেন্ট–যাকেমি. স্মিথ কথা বলার জন্য খুঁজেছিলেন।

লোকটাকে দেখে স্মিথ প্রথমে ভাবলেন কথা বলবেন। বলবেন, কী ভাবে এখানে আটকা পড়েছেন আর বেরুবার রাস্তার কথাও জানতে চাইবেন। কিন্তু লোকটা রুমে ঢুকার পর স্মিথ লক্ষ্য করলেন ওর চলাফেরার মধ্যে কেমন যেন গোপনীয়তার ভাব ফুটে উঠেছে। ওর চোরের মতো ভাব দেখে স্মিথ নিজের ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হলেন। বুঝতে পারলেন লোকটা অফিশিয়াল ডিউটি দিতে বের হয়নি। তার পায়ে ফেল্ট সোল স্লিপার। উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস নেয়ায় তার বুক দ্রুত ওঠানামা করেছে। মাঝে মাঝে দ্রুত ডানে আর বামে তাকাচ্ছে। দ্রুত নিঃশ্বাসের ফলে আলোর শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। স্মিথ অন্ধকার কোণ থেকে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন, লোকটা গোপনে এখানে এসেছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে।

বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের চলাফেরার মধ্যে কোনো ইতস্তত ভাব নেই। সে হালকা কিন্তু দ্রুত পদক্ষেপে একটা বড়ো বাক্সের কাছে গেল। পকেট থেকে চাবি বের করে বাক্সের তালা খুলল। স্মিথ দেখলেন বাক্সটার মধ্যে অনেকগুলো তাক। সবচেয়ে ওপরের তাক থেকে লোকটা একটা মমি বের করল। তারপর যথেষ্ট সতর্কতার সাথে সেটা মাটিতে নামাল। বাতিটা মমির পাশে রাখল। সে মমির পাশে প্রাচ্যদেশীয় ভঙ্গিতে বসল। এরপর কাঁপা কাঁপা হাতে মমিটাকে ঢেকে রাখা দামি লিনেনের কাপড় খুলতে শুরু করল। কাপড়ের ভাঁজগুলো খুলতেই ঘরটা এক তীব্র সুগন্ধে ভরে গেল। প্রতিটা ভাঁজ খোলার সাথে সাথে সুগন্ধি কাঠের টুকরো এবং মশলার গুঁড়ো মেঝেতে পড়ছে।

জন স্মিথ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এই মমিটি আগে কখনও খোলা হয়নি। ঘটনাটা তাকে প্রচণ্ড কৌতূহলী করে তুলেছে। প্রচণ্ড কৌতূহল তার সমস্ত দেহকে শিহরিত করে তুলল। তাঁর পাখির মতো মাথাটা দরজার পেছন থেকে ক্রমশই বেরিয়ে আসতে লাগল। যখন চার হাজার বছর পুরোনো দেহটার মাথা থেকে শেষ ভাঁজটা সরানো হলো তখন বিস্ময়ে তার গলা থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

প্রথমেই বুড়ো লোকটার হাতে একরাশ ঘন কালো চুল ঝরে পড়ল। দ্বিতীয় ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল ফর্সা কপাল। সেখানে ধনুকের মতো বাঁকানো সুন্দর দুটি ভ্রূ। তৃতীয় ভাঁজ খুলতে দেখা গেল দুটি চোখ আর উন্নত নাক। চতুর্থ এবং শেষ ভাঁজ খোলার পর

দেখা গেল মিষ্টি একটা মুখ। চিবুকের গড়নটা অপূর্ব। আসলে সমস্ত মুখটা অদ্ভুত সুন্দর। তবে একটুখানি খুঁত রয়েছে।

কপালের মাঝখানে কফি রঙের একটা ক্ষত। মেয়েটার চেহারা দেখে প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতদেহ সংরক্ষণের অপূর্ব কলাকৌশল সম্পর্কে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। মুখখানা দেখতে দেখতে স্মিথের চোখ দুটো ক্রমশ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাঁর গলা দিয়ে সন্তুষ্টির শব্দ বেরিয়ে এলো।

মেয়েটার চেহারা স্মিথের ওপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করল বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের ওপর প্রভাবের কাছে তা কিছুই নয়। সে উত্তেজিত ভাবে শূন্যে হাত ছুঁড়ে কর্কশ কণ্ঠে কী যেন বলল। তারপর মমির পাশে শুয়ে পড়ল। মমিকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁট আর কপালে বারবার চুমু খেতে লাগল। Ma petite! সে ফরাসী ভাষায় গুঙিয়ে বলল। Ma pauvrepetite! প্রচণ্ড আবেগে তার কণ্ঠস্বর বুজে গেল। তার মুখের অসংখ্য বলিরেখা তির তির করে কাঁপছে। কিন্তু স্মিথ প্রদীপের আলোয় দেখলেন, বুড়োর চকচকে চোখ দুটো শুকনো। সেগুলোতে এক ফোঁটা পানি নেই।

কয়েক মিনিট মমিটাকে জড়িয়ে ধরে সে শুয়ে রইল। সুন্দর চেহারাটার কাছে নিজের মুখ নিয়ে বিলাপ করছে। হঠাৎ সে হেসে উঠল। অজানা ভাষায় কী যেন বলল। তারপর একলাফে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে নতুন কোনও কাজ করার জন্য প্রচণ্ড শক্তি পেয়েছে।

ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট গোল বাক্স। স্মিথ জানেন, এতে প্রাচীন মিশরের নানারকম আংটি আর মূল্যবান পাথরের এক চমৎকার সংগ্রহ আছে। বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট বাক্সটার কাছে গেল।

বাক্সের তালা খুলে ঢাকনা উঁচু করল। পাশের সরু তাকের ওপর বাতিটা রাখল। পকেট থেকে একটা ছোটো মাটির পাত্র বের করে বাতির পাশে রাখল। তারপর গোল বাক্সটা থেকে এক মুঠো আংটি বের করল। তারপর গম্ভীর এবং চিন্তিতভাবে এক এক করে প্রতিটি আংটিতে পাত্র থেকে একরকমের তরল পদার্থ লাগাতে লাগল। লাগানোর পর প্রতিটি আংটি আলোর সামনে তুলে ধরে দেখতে লাগল। প্রথম দফার আংটিগুলো সম্পর্কে সে আশাহত হয়েছে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ফলে আংটিগুলোকে অধৈর্যের সঙ্গে গোল বাক্সের ভেতর ছুঁড়ে ফেলল। এরপর আরও এক মুঠো আংটি তুলল।

এগুলোর মধ্যে একটা প্রকান্ড আংটি, যাতে একটা বড়ো ক্রিস্টালের পাথর বসানো, তার মনোযোগ কাড়ল। প্রচণ্ড আগ্রহের সাথে পাত্রের তরল পদার্থ দিয়ে সে এটা পরীক্ষা করল। অচিরেই তার গলা দিয়ে আনন্দের চিৎকার বেরিয়ে এলো। আনন্দে সে শূন্যে হাত ছুঁড়ল। হাতের ধাক্কায় তাকের ওপরে রাখা মাটির পাত্র উলটে গেল। তরল পদার্থটুকু মেঝের ওপর পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তার একটা ধারা স্মিথের পায়ের কাছে গড়িয়ে আসল।

বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট তাড়াতাড়ি বুকের কাছ থেকে একটা লাল রঙের রুমাল বের করল। মেঝের ধারাটা মুছতে মুছতে ঘরের অন্ধকার কোণে বসে পড়ল। মুছতে গিয়ে এক পর্যায়ে স্মিথের মুখোমুখি হয়ে পড়ল।

এক্সকিউজ মি, স্মিথ বিনয়ের সাথে বললেন। দুর্ভাগ্যবশত আমি এই দরজার পেছনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আর আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন? বুড়ো পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল। তার মৃত-পান্ডুর মুখে তীব্র ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠেছে।

সত্যবাদী হিসেবে স্মিথের খ্যাতি আছে। হ্যাঁ, তিনি বললেন। আমি তোমার কাজ দেখেছি। তুমি যা করেছ তা দেখে আমার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জেগেছিল।

লোকটা তার পোশাকের ভেতর থেকে একটি বিরাট ছুরি বের করল।আপনি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন, সে বলল। দশ মিনিট আগেও যদি আপনাকে দেখতে পেতাম তবে এই ছুরি দিয়ে আপনার হৃৎপিন্ড ফুটো করে দিতাম। এখনও যদি আপনি আমাকে স্পর্শ করেন কিংবা আমার কাজে বাধা দেন তা হলে মরা মানুষে পরিণত হবেন।

তোমাকে বাধা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, স্মিথ জবাব দিলেন। এখানে আমার উপস্থিতি নিছকই দুর্ঘটনা। এখন তুমি যদি আমাকে বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও

তবে তোমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। অত্যন্ত ভদ্র এবং নরম গলায় স্মিথ কথাগুলো বললেন। কারণ লোকটা তার নিজের বাম হাতের তালুতে ছুরির ধারাল ডগাটা দিয়ে মৃদু চাপ দিচ্ছিল। বোধহয় ছুরিটার তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে চাইছে। তার চেহারায় এখনও ঘৃণার ভাব স্পষ্ট।

যদি বুঝতে পারতাম... সে বলল। কিন্তু না, হয়তো ভালোই হয়েছে। আপনার নাম কী?

স্মিথ নিজের নাম বললেন।

জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ, লোকটা পুনরাবৃত্তি করল। আপনি কি সেই লোক যিনি লন্ডনে এলকাবের ওপর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন? রিপোর্টটা আমি পড়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার জ্ঞান অতি নগণ্য।

স্যার! দারুণ বিস্ময়ে মিশরতাত্ত্বিক ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ চিৎকার করে উঠলেন।

তবে অনেকের চেয়ে আপনার গবেষণাপত্রটা অনেক উন্নত মানের। আমাদের প্রাচীন মিশরীয় জীবনের মূল নীতির কথা আপনারা কোনো লিপি অথবা স্মৃতিস্তম্ভে খুঁজে পাবেন না। অথচ আপনারা এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেন।

আমাদের প্রাচীন মিশরীয় জীবন! স্মিথ বিস্ফারিত চোখে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, ঈশ্বর, মমির মুখের দিকে তাকান!

অদ্ভুত লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে মমির মুখের ওপর আলো ফেলল। তার গলা থেকে বেদনামাখা বিলাপ ধ্বনি বেরিয়ে এল। বাইরের বাতাস মৃতদেহ সংরক্ষণের কলা-কৌশলকে এটুকু সময়ের মধ্যে অনেকখানি নষ্ট করে ফেলেছে। মমির মুখের চামড়া বিবর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, বিবর্ণ ঠোঁট দুটো কুঁচকে যাওয়ায় হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কেবল মাত্র কপালের ওপরকার বাদামী চিহ্নটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ হলো সেই মুখ যেটায় কিছুক্ষণ আগেও ছিল যৌবন আর সৌন্দর্য।

দুঃখে আর আতঙ্কে সে হাত ঘষল। তারপর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে স্মিথের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল।

এটা কোনো ব্যাপার নয়, লোকটা কাঁপা কণ্ঠে বলল। সত্যিই এটা কোন ব্যাপার না। আজ রাতে একটা কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। কাজটা হয়ে গেছে। আর সব কিছু আমার কাছে মূল্যহীন। আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি। পুরোনো অভিশাপ দূর হয়েছে। এখন ওর সাথে। আমি মিলতে পারব। ওর দেহের কী হলো তা কোনও বিষয় নয়। ওর আত্মা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এগুলো পাগলের প্রলাপ, স্মিথ বললেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল যে তিনি এক পাগলের পাল্লায় পড়েছেন।

সময় নেই, আমাকে যেতে হবে, অ্যাটেনডেন্ট বলল। সুদীর্ঘ কাল ধরে যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সেই মুহূর্ত এসে গেছে। কিন্তু প্রথমে আপনাকে বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেব। আমার সাথে আসুন।

বাতি হাতে নিয়ে অ্যাটেনডেন্ট অগোছাল ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। স্মিথ তাকে অনুসরণ করলেন। তারা দ্রুত ঈজিপশিয়ান, অসিরিয়ান আর পারসিয়ান সংগ্রহের ঘরগুলো অতিক্রম করলেন। শেষে বুড়ো দেয়ালের গায়ে একটা ছোটো দরজার পাল্লা মৃদু ধাক্কা মেরে খুলল। দেখা গেল একটা ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। তারা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। স্মিথ কপালে রাতের ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ পেলেন। এবার উলটো পাশে একটা দরজা দেখলেন, যেটা দিয়ে রাস্তায় বেরুনো যায়। তার ডান পাশে আরেকটা দরজা খোলা, যেটা থেকে বাতির হলুদ আলো প্যাসেজের ওপর পড়েছে। এ ঘরের ভেতরে আসুন, অ্যাটেনডেন্ট সংক্ষেপে বলল।

স্মিথ ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে এই অভিযানের সমাপ্তি বুঝি এখানেই ঘটবে। যদিও কৌতূহল অমীমাংসিত রেখে যেতে পারছেন না তিনি। তাই অদ্ভুত লোকটার সাথে আলোকিত ঘরটায় ঢুকলেন।

ঘরটা ছোটো। সাধারণত দারোয়ানদের এরকম ঘর দেওয়া হয়। ভেতরে আগুন রাখার তাওয়ায় আগুন জ্বলছে। এক পাশে একটা চাকাওয়ালা চৌকির ওপর বিছানা পাতা। আরেক পাশে একখানা অমসৃণ কাঠের চেয়ার। মাঝখানে একটা গোল টেবিল রয়েছে। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে রাতের খাবারের অবশিষ্ট পড়ে আছে।

স্মিথ লক্ষ্য করলেন ঘরের আসবাবগুলো তৈরির মধ্যে প্রাচীন কারিগরি দক্ষতার ছাপ বিদ্যমান। মোমবাতি, মোমদানি, চুলো খোঁচাবার শিক, দেয়ালে ঝোলানো নকশা– সবগুলোর মধ্যে সুদূর অতীতের ছাপ রয়েছে।

বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট বিছানার কিনারায় বসে অতিথিকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল। হয়তো আমার ভাগ্যে এই ছিল, বুড়ো চমৎকার ইংরেজিতে বলল। ভাগ্য হয়তো আগেই ঠিক করে রেখেছে যে যাওয়ার আগে আমি একটা বিবরণ রেখে যাব। এ বিবরণ হচ্ছে সেই লোকদের জন্য যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের বুদ্ধি কাজে লাগাতে চায়। আমি আপনাকে সেই কথা বলতে চাই। চাই আপনার মাধ্যমে সবাই এই কথা জানতে পারুক। পরজগতের দোরগোড়ায় পা রেখে আমি আপনাকে আমার জীবনের গল্প বলছি।

.

আপনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন আমি মিশরীয়। প্রাচীন মিশরে জন্মেছিলাম আমি। কী, অবাক হচ্ছেন? বিশ্বাস করছেন না? আগে আমার বিচিত্র কাহিনি পুরোটা শুনুন। বুড়ো

একটু থেমে আবার বলল, তো যা বলছিলাম, আমি জন্মেছিলাম প্রাচীন মিশরে। আজ যে পদদলিত দাসজাতি নীলনদের তীরে বাস করছে আমি সে গোত্রের কেউ নই। প্রাচীন মিশরে যে বীর্যবান আর পরিশ্রমী জাতি বাস করত, যারা ইহুদিদের বশ করেছিল আর দুর্ধর্ষ ইথিওপিয়ানদের দক্ষিণের মরুভূমিতে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যারা বিশাল বিশাল পিরামিড তৈরি করেছিল, সেই জাতিতে আমার জন্ম।

যীশুর জন্মের মোলোশো বছর আগে ফারাও Tuthmosis-এর রাজত্বকালে আমি পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলাম। আপনি আমার কাছ থেকে দূরে সরে বসছেন। ভয় পাচ্ছেন? কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে আমার কাহিনি শুনুন। তা হলে বুঝতে পারবেন, আমি যতটা না ভয়ের তার চেয়ে অনেক বেশি করুণার পাত্র।

আমার নাম সোসরা। আমার বাবা ছিলেন আবরিস এর ওসাইরিস দেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। মন্দিরটা ছিল নীলনদের বুবাস্তিক শাখার তীরে। এই মন্দিরেই আমি পালিত হয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে সব রকমের অতীন্দ্রিয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। এই বিদ্যা সম্পর্কে আপনাদের বাইবেলেও লেখা আছে। আমি মেধাবী ছাত্র ছিলাম। দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী পুরোহিত আমাকে যা শেখাতে পারতেন না, ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই আমি তা শিখে ফেললাম। ওই সময় থেকে আমি নিজেই প্রকৃতির গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলাম। আমার এই জ্ঞানের কথা আমি কাউকে জানাইনি।

সমস্ত প্রশ্নের থেকে একটা প্রশ্ন আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল। প্রশ্নটা হলো জীবনের প্রকৃতি কী? এই বিষয়ে আমি অনেক গবেষণা করতে শুরু করলাম। এর মূলনীতির গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলাম। ওষুধের লক্ষ্য হলো রোগ হলে দেহ থেকে রোগকে তাড়িয়ে দেয়া। আমার মনে হলো এমন একটা পদ্ধতি কি আবিষ্কার করা যায় যাতে দেহে কোন দিন দুর্বলতা কিংবা মৃত্যু বাসা বাঁধতে না পারে? আমার গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অর্থহীন। করলেও আপনি বুঝতে পারবেন না। এ গবেষণার জন্য আমাকে দীর্ঘকাল অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। এ পরীক্ষার কিছু অংশ পশুর ওপর, কিছু অংশ ক্রীতদাসদের ওপর আর কিছু অংশ আমার নিজের ওপর চালিয়েছিলাম। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকুই বলি, দীর্ঘ গবেষণার ফলে আমি এমন একটা তরল পদার্থ আবিষ্কার করেছিলাম যেটা ইনজেকশন দিয়ে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করালে মানবদেহ সময়, হিংস্রতা অথবা রোগের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এর ফলে মানুষ অমর হবে না কিন্তু ওষুধের কার্যকারিতা থাকবে হাজার বছর ধরে। ফলে সে বেঁচে থাকবে সহস্র বছর।

প্রথমে একটা বিড়ালের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করলাম। তারপর তার শরীরে মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু তীব্র বিষেও বিড়ালটি মরল না। আজও লোয়ার ঈজিপ্টে ওটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে কোনও রহস্য বা জাদু নেই। এটা নিছকই এক রাসায়নিক আবিষ্কার। যেটা আবারও তৈরি করা যেতে পারে।

যৌবনে যে কেউ জীবনকে ভালোবাসে। আমার মনে হলো জীবনের সমস্ত দুশ্চিন্তার বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেয়েছি আমি। কারণ মৃত্যুকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারব বহু দূরে। অত্যন্ত হালকা মনে আমি আমার আবিষ্কৃত সেই অভিশপ্ত জিনিসটি আমার শিরায় ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর এমন একজনকে খোঁজ করতে লাগলাম যাকে আমি আমার দীর্ঘ জীবনের সঙ্গী করতে পারি।

মহান দেবতা থোথ-এর মন্দিরে এক তরুণ পুরোহিত ছিল। তার নাম পারমেস। সে প্রকৃতি আর পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিল। এ জন্য ওকে আমি খুব পছন্দ করতাম। আমার এই গোপন আবিষ্কারের ব্যাপারে ওকে সব খুলে বললাম। ও উৎসাহিত হয়ে আমাকে অনুরোধ করায় ওর শরীরে ওই ওষুধ ঢুকিয়ে দিলাম। ভাবলাম, এই সুদীর্ঘ জীবনে একজন সাথি পেলাম।

এই বিরাট আবিষ্কারের পর আমার গবেষণায় কিছুটা ঢিল পড়ল। কিন্তু পারমেস দ্বিগুণ উদ্যমে গবেষণা শুরু করল। প্রতিদিন তাকে থোথের মন্দিরে গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করতে দেখেছি। কিন্তু ওর কাজ সম্পর্কে খুব কম কথাই আমাকে বলতো। আমি শহরের পথে পথে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতাম। আনন্দের দৃষ্টিতে চার পাশে তাকিয়ে ভাবতাম এ সবই চলে যাবে শুধু আমি টিকে থাকব। পথচারীরা মাথা নুইয়ে আমাকে সম্মান জানাতো। কারণ পন্ডিত হিসেবে বিদেশেও আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

এ সময় দেশে যুদ্ধ শুরু হলো। হেক্সোমদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মহান ফারাও পূর্ব সীমান্তে একদল সৈন্য পাঠালেন। আবরিসে একজন গভর্নর পাঠালেন যাতে ফারাওদের শাসন কায়েম করতে পারেন। শুনেছিলাম গভর্নরের মেয়ে নাকি খুব সুন্দরী। একদিন পারমেসকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে তার সঙ্গে দেখা হলো। চারজন ক্রীতদাস একটা পালকিতে করে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম দেখাতেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম।

আমি আর আমার মাঝে রইলাম না। ভাবলাম, এই-ই আমার জীবনের কাঙ্খিত নারী। ওকে ছাড়া আমার জীবন ধারণ অসম্ভব। মহান দেবতা হোরাস-এর নামে শপথ করলাম, ওকে নিজের করে পেতেই হবে। আমার মনের কথা পারমেসকে জানালাম, কিন্তু ও আমার কাছ থেকে চলে গেল। দেখলাম ওর মুখটা মাঝরাতের অন্ধকারের মতো কালো হয়ে গেছে।

সেই মেয়ের সাথে আমার ভালোবাসার কাহিনি আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এতটুকুই বলব, আমি যেমন তাকে ভালোবাসতাম, সেও আমাকে তেমনি গভীরভাবে ভালোবাসত। শুনেছিলাম, আমার সাথে দেখা। হওয়ার আগেই নাকি পারমেসের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। পারমেস তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। কিন্তু এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম। কারণ আমি জানতাম ওর হৃদয় আমার।

এ সময় এক দুর্যোগ দেখা দিল। আমাদের শহরে হোয়াইট প্লেগের আক্রমণ হলো। অনেকেই মারা যেতে লাগল। কিন্তু আমি অসুস্থ লোকদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কারণ আমার কোনো ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। আমার সাহস দেখে গভর্নরের মেয়ে মানে আমার প্রেমিকা বিস্মিত হলো। আমি তাকে আমার গোপন আবিষ্কারের কথা বললাম। অনুরোধ করলাম আমার এই চমৎকার আবিষ্কার ব্যবহারের জন্য।

আমার ওষুধ তোমার ওপর প্রয়োগ করতে দাও, আতমা (Atma), আমি বললাম। তা হলে ফুলের মতো তোমার এই সুন্দর শরীর কখনও শুকিয়ে যাবে না। হাজার হাজার বছর চলে যাবে কিন্তু আমরা এবং আমাদের ভালোবাসা চিরকাল রয়ে যাবে। ফারাও শেফুর বিরাট পিরামিড ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরও আমরা রয়ে যাব।

কিন্তু ওর মনে সংশয় ছিল। এটা কি ঠিক হবে? আমাকে ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। এর ফলে কি দেবতার ইচ্ছাকে বাধা দেয়া হবে না? মহান দেবতা ওসাইরিস যদি আমাদের দীর্ঘ জীবন চাইতেন, তবে তিনি নিজেই কি ব্যবস্থা করতেন না?

ভালোবাসার কথা বলে আমি ওর সন্দেহ দূর করলাম। যদিও ও ইতস্তত করছিল। বলেছিল, এটা একটু বড়ো প্রশ্ন। ভেবে দেখার জন্য আমার কাছে এক রাত সময় চাইল। বলল যে আগামীকাল সকালে ওর জবাব জানতে পারব। যদিও এক রাত বেশি সময় নয়। আমাকে বলেছিল, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইসিসের কাছে সাহায্য চাইবার জন্য প্রার্থনা করবে।

এক বুক সংশয় আর মনের মধ্যে অমঙ্গলের চিন্তা নিয়ে ওর কাছ থেকে বাড়ি ফিরে আসলাম। পরদিন সকালে মন্দিরের প্রথম বলিদান শেষ হওয়ার পরেই আমি আমাদের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলাম। প্রাসাদে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় এক ক্রীতদাসীর সাথে দেখা হলো। সে বলল, তার মনিব কন্যা খুব অসুস্থ। একথা শুনে পাগলের মতো ছুটে ওর ঘরে চলে গেলাম। দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছে ও। মাথাটা বালিশের ওপর। মুখটা বিবর্ণ, চোখ দুটো চকচক করছে। ওর কপালের মাঝ বরাবর একটা বেগুনি রঙের ক্ষত জ্বলজ্বল করছে। ক্ষতটা দেখেই বুঝতে পারলাম কী হয়েছে। এ হলো হোয়াইট প্লেগের চিহ্ন। একে অনিবার্য মৃত্যুর চিহ্নও বলা যায়।

আতমা বাঁচল না।

সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা কী বলব! মাসের পর মাস আমি পাগলের মতো আচরণ করতে লাগলাম। জ্বরে আক্রান্ত শরীরে ভুল বকতে লাগলাম। কিন্তু আমি মরতে পারলাম না। মৃত্যুকে আমি যেমন করে কামনা করেছিলাম, মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত কোনও আরবও বুঝি তেমনভাবে পানির খোঁজ করে না। যদি বিষ অথবা অস্ত্রের আঘাতে মরতে পারতাম তবে পরজগতে আমার ভালোবাসার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য একটুও দেরি করতাম না। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোন ফল হয়নি। সেই অভিশপ্ত ওষুধ আমার দেহে শক্ত প্রভাব বিস্তার করে বসেছে।

এক রাতে দুর্বল শরীরে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ পারমেস আমার ঘরে প্রবেশ করল। ও বাতির আলোর বৃত্তের মাঝে দাঁড়াল। ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। দেখলাম ওর চোখে বিজয়ের দৃষ্টি।

তুমি আমাকে মরতে দিলে কেন? পারমেস আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমাকে যেমন দীর্ঘায়ু করেছ, ওকে কেন করলে না?

দেরি করে ফেলেছিলাম, আমি জবাব দিলাম। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম তুমিও তো ওকে ভালোবাসতে। তুমি আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গী। একদিন পরজগতে ওকে আমরা ঠিকই দেখতে পাব। কিন্তু এর জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে। চিন্তাটা কত ভয়ঙ্কর, তাই না? মূর্খ, আমরা মূর্খ। মৃত্যুকে আমরা শত্রু বলে গণ্য করেছিলাম।

একথা তুমি বলতে পার, উন্মাদের মতো হেসে পারমেস বলল। তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কথা বেরুতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এসব অর্থহীন।

কী বলতে চাও তুমি? আমি চিৎকার করে বললাম, কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসলাম। শোকে নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

পারমেসের চেহারায় আনন্দের ছাপ। ওর সারা শরীর এমন ভাবে কাঁপছে যেন শয়তান ভর করেছে।

জান, আমি কোথায় যাচ্ছি? ও জিজ্ঞাসা করল।

না, আমি জবাব দিলাম। বলতে পারব না।

আমি আমার কাছে যাচ্ছি, পারমেস বলল। শহরের প্রাচীরের বাইরে জোড়া খেজুর গাছের পাশের সমাধিতে শুয়ে আছে ও।

ওখানে কেন যাবে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মরতে! পারমেস চিৎকার করে বলল। মরতে যাচ্ছি! পৃথিবীর আর কোনো কিছু আমাকে আটকাতে পারবে না।

কিন্তু তুমি মরতে পারবে না, আমি চিৎকার করে বললাম। তোমার রক্তে এখনও ওই অভিশপ্ত ওষুধের প্রভাব রয়েছে।

আমি ওটাকে অগ্রাহ্য করতে পারব, পারমেস বলল। এমন একটা শক্তিশালী ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি যেটা তোমার ওষুধের প্রভাব নষ্ট করে ফেলতে পারবে। আমার শরীরে এখন ওটা কাজ করছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি মারা যাচ্ছি। আমি আমার সাথে মিলিত হব। কিন্তু তুমি এই জীবনের বোঝা বইবার জন্য পড়ে থাকবে।

পারমেসের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ও সত্যি কথাই বলছে। ওর চোখের আলো সেই কথাই বলছে।

তুমি আমাকে শেখাও! আমি বললাম।

কখনও না! পারমেস জবাব দিল।

মহান দেবতা থোথ আর আনুবিসের নামে তোমার কাছে অনুরোধ করছি!

কোনো লাভ হবে না, পারমেস শীতল কণ্ঠে বলল।

তা হলে আমি নিজেই খুঁজে নেব, আমি চিৎকার করে বললাম।

পারবে না, পারমেস বলল। আমি দৈবক্রমে এটা আবিষ্কার করেছি। ওষুধের মধ্যে এমন একটা উপাদান আছে, যা তুমি কখনও সংগ্রহ করতে পারবে না। থোথ-এর আংটির মধ্যে যেটুকু ওষুধ আমি রেখেছি, তার বাইরে এক ফোঁটা ওষুধও কেউ কোনোদিন তৈরি করতে পারবে না।

থোথের আংটির মধ্যে? আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। আংটিটা কোথায়?

তুমি একথা কখনও জানতে পারবে না, পারমেস বলল। তুমি আমার ভালোবাসা পেয়েছিলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে জিতল? তোমাকে আমি এই নোংরা পৃথিবীতে রেখে আমার কাছে চলে যাব। পারমেস পাগলের মতো ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন সকালে খবর পেলাম থোথের তরুণ পুরোহিত মারা গেছে।

এরপর আমার দিনগুলো গবেষণার মধ্যে কাটতে লাগল। সেই বিষের সন্ধান আমাকে অবশ্যই পেতে হবে। যেটা আমার ওষুধের প্রভাব নষ্ট করে আমাকে মৃত্যু দান করবে। ভোর থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত আমি টেস্টটিউব আর ফার্নেস নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। থোথের মন্দির থেকে পারমেসের ব্যবহৃত প্যাপিরাস আর ফ্লাস্কগুলো সংগ্রহ করলাম। কিন্তু হায়! ওগুলো থেকে কিছুই জানতে পারলাম না। প্যাপিরাসগুলোতে লেখা কিছু ইঙ্গিত আমার মনে আশা জাগিয়ে তুলল। কিন্তু কোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলাম না। মাসের পর মাস আমি কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে যখনই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন জোড়া খেজুর গাছের পাশে আমার সমাধিতে হাজির হতাম। সেখানে আতমার উপস্থিতি অনুভব করতাম। ওর উদ্দেশ্য ফিসফিস করে বলতাম, ওর কাছে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

পারমেস বলেছিল ওর আবিষ্কারের সাথে থোথের আংটির সম্পর্ক রয়েছে। আংটিটার কথা আমার মনে আছে। ওটা একটা বিরাট আর ভারী আংটি। আংটিটা সোনা দিয়ে তৈরি নয়। এক ধরনের ভারী দুর্লভ ধাতু দিয়ে তৈরি, যেটা হারবাল পর্বত থেকে আনা

হয়েছিল। মনে পড়ল, বিরাট ওই আংটিটায় একখন্ড ফাঁপা স্ফটিক বসানো রয়েছে। হয়তো ওটার মধ্যেই পারমেসের আবিষ্কৃত ওষুধের কয়েক ফোঁটা থাকতে পারে। পারমেসের গোপন আবিষ্কার ধাতুর সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ প্রাটিনামের তৈরি অনেকগুলো আংটি থোথের মন্দিরে আছে। তা হলে কি পারমেস তার আবিষ্কৃত ওষুধ ফাঁপা স্ফটিকের মধ্যে জমা রেখেছে? এ সিদ্ধান্তে আসার পর আমি তন্নতন্ন করে পারমেসের কাগজ পত্র পরীক্ষা করতে লাগলাম। একখানা কাগজ থেকে জানলাম আমার ধারণাই ঠিক। স্ফটিক খন্ডের মধ্যেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই বিষ। সেই বিষের কয়েক ফোঁটা তখনও ব্যবহার করা। হয়নি।

কিন্তু আংটিটা খুঁজে পাব কীভাবে? আংটিটা পারমেসের সাথে ছিল না। ওর মৃতদেহটা মমিতে পরিণত করার সময় তা পাওয়া যায়নি। তার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাঝেও আংটিটা পাওয়া যায়নি। যে সব জায়গায় ও যেত সেখানেও খুঁজে দেখেছি। কিন্তু পাইনি। এ সময় নতুন এক দুর্ভাগ্য না এলে হয়তো শেষ পর্যন্ত আমার পরিশ্রম সার্থক হতো।

হিসোসদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। ফারাও-এর সেনাবাহিনী সেই যুদ্ধে পরাজিত হলো। এই মেষ পালক জাতি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা আমাদের সবকিছু লুটপাট করতে লাগল। এই এলাকায় দিনের বেলায় বইতে লাগল রক্ত স্রোত আর রাতের বেলায় জ্বলতে লাগল আগুন। আমাদের আবারিস ছিল মিশরের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু ওই বর্বরদের আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। নগরীর পতন হলো। গভর্নর এবং সৈন্যদের হত্যা করা হলো। আর অন্যদের সাথে আমি বন্দি হলাম।

বছরের পর বছর ধরে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে আমি পশু চরাতে লাগলাম। আমার প্রভু মারা গেল। তার ছেলেও বুড়ো হলো। কিন্তু মৃত্যু থেকে তখনও আমি বহু দূরে। অবশেষে একদিন একটা দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে আমি পালালাম। এগিয়ে চললাম মিশরের দিকে। হিকসোসরা মিশরে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের রাজা দেশটা শাসন করছে। আবারিস নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে।

শহরটাকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। বিরাট বিরাট মন্দিরগুলোর জায়গায় এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ। প্রতিটা কবর লুট করা হয়েছে। প্রত্যেকটা স্মৃতিসৌধ ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমার আমার সমাধির কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মরুভূমির বালির তলায় হারিয়ে গেছে সেই সমাধি। যে পোড়া খেজুর গাছ। সমাধিটাকে চিহ্নিত করতো তার কোনও চিহ্ন নেই।

পারমেসের কাগজপত্র এবং থোথের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হয় ধ্বংস হয়েছে, নয়ত ছড়িয়ে পড়েছে সিরিয়া মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অনেক খুঁজলাম। কিন্তু সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হলো।

তখন থেকেই থোথের আংটি এবং তার মধ্যে লুকানো পারমেসের ওষুধ খুঁজে পাবার আশা আমি ত্যাগ করেছি। মনস্থির করলাম যতদিন ওষুধের প্রভাব কেটে না যায় ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব। সময় যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা আপনি কীভাবে

বুঝবেন? কালস্রোত অসীম, অনন্ত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কালের এই সীমিত গন্ডির মাঝেই আপনাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমি জানি। যুগ-যুগ ধরে কালের অসীম স্রোতে ভেসে চলছি আমি। ইতিহাসের উত্থান পতন আমি নিজের চোখে দেখেছি। ট্রয় নগরীর . পতন যখন হয় তখন আমি বৃদ্ধ। হেরোগেটাস যখন মেমফিস নগরীতে আসে, আমি তখন অতি বৃদ্ধ। যীশু খ্রিস্ট যখন পৃথিবীতে তাঁর নতুন বাণী প্রচার করলেন, আমি তখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছি।

কিন্তু আজও আপনি আমাকে জীবিত মানুষ হিসেবেই দেখছেন। কারণ আমার রক্তে ওই অভিশপ্ত পদার্থ এখনও ক্রিয়াশীল। তবে এবার আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।

এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি সব দেশে ঘুরেছি, সব জাতির সাথে বসবাস করেছি। পৃথিবীর সব ভাষাই আমার কাছে একই রকম। ক্লান্তিকর সময় কাটানোর জন্য আমি সব ভাষা শিখেছি। সময় যে কীভাবে ধীরে চলে তা আপনাকে কীভাবে বোঝাব? বর্বরতার মধ্যযুগ আর আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ আমার নিজের চোখে দেখা। এসবই আমি পেছনে ফেলে এসেছি। অন্য কোনো নারীর দিকে কখনও আমি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাইনি। আতমা জানে আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি।

প্রাচীন মিশর সম্পর্কে গবেষকরা যা লিখতেন তা পড়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এই দীর্ঘ জীবনে অনেক কাজ করেছি। কখনো প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেছি, কখনওবা দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু যে অবস্থায়ই থাকি না কেন প্রাচীন মিশর সংক্রান্ত পত্র-

পত্রিকা সব সময় কিনেছি। নয় মাস আগে আমি সানফ্রান্সিসকোতে ছিলাম। সেখানে এক পত্রিকায় পড়লাম, প্রাচীন আবারিস নগরীর কাছাকাছি এলাকার বালির তলা থেকে কিছু প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। খবরটা পড়ে আমার বুক ধক করে উঠল। ওখানে আরও লেখা ছিল, যিনি খননের দায়িত্বে আছেন, বর্তমানে তিনি সদ্য আবিষ্কৃত গেছে। মমিটির কফিন এখনও ভোলা হয়নি। কফিনের ওপর একটা চিত্রলিপি আছে তাতে লেখা-ফারাও টুথমোসিসের আমলের গভর্নরের কন্যা এখানে শুয়ে আছেন।

পত্রিকায় আরও লেখা আছে, কফিনের ঢাকনা সরাবার পর মমিটার বুকে একটা প্লাটিনামের বড়ো আংটি পাওয়া গেছে। তাতে বিরাট একখন্ড স্ফটিক বসানো। বুঝতে পারলাম, পারমেস এখানেই থোথের আংটি লুকিয়ে রেখেছিল। আর এজন্য ও বলেছিল, অতি নিরাপদ জায়গায় আংটিটা লুকিয়ে রেখেছে। কারণ কোনো মিশরীয়ই মমির অভিশাপ নেওয়ার জন্য কফিনের ঢাকনা খুলবে না।

ওই রাতেই আমি সানফ্রান্সিসকো ত্যাগ করলাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরবিসে পৌঁছে গেলাম। অতীতের সেই সমৃদ্ধ নগরীর জায়গায় বর্তমানে কয়েকটা বালুর স্তূপ আর ভাঙাচোরা কয়েকটা প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই নেই। কয়েকজন ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক এখানে খনন করছিল। তাদের কাছে গিয়ে আংটিটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল যে আংটি আর মমিটা কায়রোর বুলাক জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমি বুলাক জাদুঘরে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, ম্যারিয়েট বে নামে এক লোক আংটি আর মমির মালিকানা দাবি করেছে। তাই ওগুলো তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে শুনলাম তিনি দুটি জিনিসই লুভর মিউজিয়ামের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ওগুলোকে অনুসরণ করে অবশেষে আমি ভরে হাজির হলাম। সুদীর্ঘ চার হাজার বছর পর আমার আমার দেহাবশেষ খুঁজে পেলাম আমি। খুঁজে পেলাম সেই আংটি, যেটাকে এতকাল তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।

কিন্তু ওগুলো হাতে পাবো কীভাবে? কেমন করে ওই মূল্যবান বস্তু দুটি আমি একান্ত করে পাবো? এবার ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হলো। মিউজিয়ামের মিশরীয় সংগ্রহশালার অ্যাটেনডেন্টের পদ খালি হলো। আমি সোজা ডিরেক্টরের কাছে চলে গেলাম। তাকে বোঝাতে পারলাম যে প্রাচীন মিশর সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি।

অতি আগ্রহে হয়তো একটু বেশিই বলে ফেললাম। আমার কথা শুনে ডিরেক্টর মন্তব্য করলেন, তোমাকে তো দেখছি সামান্য অ্যাটেনডেন্টের পদের চেয়ে অধ্যাপকের পদেই বেশি মানায়। তারপরও তিনি আমাকে চাকরি দিলেন। আর এভাবেই আমি এই চাকরিটা পেলাম। এখানে আজকেই আমার প্রথম এবং শেষ রাত।

মি. ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ, এই হলো আমার কাহিনি। আপনার মতো বিদ্বান ব্যক্তির কাছে এর বেশি কিছু আমার বলার নেই। আজ রাতে দৈবক্রমে আপনি সেই নারীর মুখ দেখলেন যাকে সুদূর অতীতে আমি ভালোবেসেছিলাম। বাক্সের মধ্যে স্ফটিক বসানো অনেকগুলো

আংটি রয়েছে। কিন্তু আমার সেই প্লাটিনামের আংটিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল।

আংটিটার স্ফটিক খণ্ডের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছি ওটার ভেতরে পারমেসের আবিষ্কৃত ওষুধের কয়েক ফোঁটা রয়ে গেছে। অবশেষে আমার এই সুদীর্ঘ অভিশপ্ত জীবনের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে।

মি. স্মিথ, আপনার কাছে আমার আর কিছু বলার নেই। এ কাহিনি এতকাল আমার মনের মধ্যে ছিল। আজকে আপনার কাছে বলে মুক্তি পেলাম। ইচ্ছে করলে আমার জীবনের ইতিহাস আপনি অন্য লোকদের কাছে বলতে পারেন আবার নাও বলতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রইল।

আজ রাতে আপনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন। আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোনো বাধাই আমি সহ্য করতাম না। আমার কাজ শেষ হওয়ার আগে যদি আপনাকে দেখতে পেতাম তা হলে আমাকে বাধা দেওয়ার বা কোনো রকম বিপদ সংকেত জানানোর সুযোগটুকু পর্যন্ত আপনাকে দিতাম না। এবার আপনাকে বাইরে বেরুবার রাস্তা দেখিয়ে দিই। এই দরজা দিয়ে বেরুলে আপনি Rue de Rivoli রাস্তায় যেতে পারবেন। শুভ রাত্রি, মি. স্মিথ।

মি. জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ যেতে যেতে পেছনে ফিরে তাকালেন। মুহূর্তের জন্য সোসরার কৃশ দেহটা সরু দরজা পথে দেখতে পেলেন। পরমুহূর্তে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। খিল আটকানোর গুরুগম্ভীর শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিল।

.

লন্ডনে ফিরে আসার দুদিন পরে মি. জন ভ্যান্সিটার্ট স্মিথ দি টাইমস পত্রিকায় একটি খবর পড়লেন। খবরটি পাঠিয়েছে সংবাদপত্রের প্যারিস সংবাদদাতা। সংবাদটি হচ্ছে :

স্যুভর মিউজিয়ামে অস্বাভাবিক ঘটনা

গতকাল সকালে মিউজিয়ামের বড়ো ঈজিপশিয়ান চেম্বারে এক অদ্ভুত আবিষ্কার হয়েছে। সকালে ঝাড়ুদারেরা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে ঈজিপশিয়ান চেম্বারের নবনিযুক্ত বুড়ো অ্যাটেনডেন্টের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মৃত ব্যক্তি দুহাত দিয়ে সদ্য সংগৃহীত মমি জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। মৃত ব্যক্তি এত দৃঢ় ভাবে মমিটাকে আলিঙ্গন করে রেখেছিল যে অনেক কষ্টে তাদেরকে আলাদা করা গেছে। একটা বড়ো বাক্সে অনেকগুলো মূল্যবান আংটি ছিল। বাক্সটা খুলে সেগুলো এলোমলো করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ধারণা লোকটা মমি চুরি করে ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু মমি নিয়ে যাওয়ার সময় হয়তো হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। লোকটার বয়স কত বা দেশ কোথায় কিছুই জানা যায়নি। তার এই অস্বাভাবিক ও

নাটকীয় মৃত্যুতে শোক করার জন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রাখলেন স্মিথ। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল লুভর মিউজিয়াম। মনে পড়ল সেই রাতের কথা...সেই রহস্যময় মানুষটির কথা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : তারক রায়

# ভূতি বিড়াল

ছেলেবেলা থেকেই আমি পশুপাখি খুব ভালোবাসি। আমার স্বভাবও ছিল শান্ত। জন্তুজানোয়ার পুষতে ভীষণ ভালোবাসতাম। বড়ো হলাম কিন্তু স্বভাব পালটাল না।

বিয়ে করলাম অল্প বয়সে। বেশ মনের মতো বউ পেলাম। স্বভাবটি মিষ্টি। শান্ত। জন্তুজানোয়ার পোষার শখ আমার মতোই। আমাদের শখের চিড়িয়াখানায় একটা বেড়ালও ছিল। কালো বেড়াল।

শুধু কালো নয়, বেড়ালটা বেশ বড়োও বটে। বুদ্ধিও তেমনি। বেড়ালের মগজে যে এত বুদ্ধি ঠাসা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বউ কিন্তু কথায় কথায় একটা কথা মনে করিয়ে দিত আমাকে। কালো বেড়ালকে নাকি ছদ্মবেশী ডাইনী মনে করা হতো সেকালে। আমি ওসব কুসংস্কারের ধার ধারতাম না।

বেড়ালটার নাম পুটো। অষ্টপ্রহর আমার সঙ্গে থাকত, পায়ে পায়ে ঘুরত, আমার হাতে খেত, আমার কাছে ঘুমাতো। পুটোকে ছাড়া আমারও একদিন চলত না।

বেশ কয়েক বছর পুটোর সঙ্গে মাখামাখির পর আমার চরিত্রের অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা গেল।

ছিলাম ধীর, শান্ত। হয়ে উঠলাম অস্থির, অসহিষ্ণু, খিটখিটে। মেজাজ এমন তিরিক্ষে হয়ে উঠল যে বউকে ধরেও মারধর শুরু করলাম। পুটোকেও বাদ দিলাম না।

এক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি এসে দেখি পুটো আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। আর যায় কোথায় মাথায় রক্ত উঠে গেল আমার, খপ করে চেপে ধরলাম। ফাঁস করে সে কামড়ে দিল আমার হাতে। আমি রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম। পকেট থেকে ছুরি বের করে পুটোর টুটি ধরলাম এক হাতে আরেক হাতে ধীরে সুস্থে উপড়ে আনলাম একটা চোখ।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার পর একটু অনুতাপ হলো বৈকি। উত্তেজনা মিলিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে কিন্তু পুটো আমার ছায়া মাড়ানো ছেড়ে দিল। চোখ সেরে উঠল দুদিনেই। কিন্তু আমাকে দেখলেই সরে যেত কালো ছায়ার মতো।

আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে পশু প্রবৃত্তি আবার জেগে উঠল। যে বিড়াল আমাকে এত ভালোবাসত, হঠাৎ আমার ওপর তার এত ঘৃণা আমার মনের মধ্যে শয়তানী প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে লাগল। সে কিন্তু কোনো দিন ক্ষতি করেনি আমার। তা সত্ত্বেও ওকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্যে হাত নিশপিশ করতে লাগল আমার।

একদিন সত্যি সত্যিই ফাঁসি দিলাম পুটোকে। বাগানের গাছে লটকে দিলাম দড়ির ফাঁসে। ও মারা গেল। আমিও কেঁদে ফেললাম। মন বলল, এর শাস্তি আমাকে পেতেই হবে।

সেই রাতেই আগুন লাগল বাড়িতে। রহস্যময় আগুন। জ্বলন্ত মশারী থেকে বউকে নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলাম পুড়ছে সারা বাড়ি।

দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা বাড়ি। খাড়া রইল শুধু একতলার একটা দেয়াল। পাড়ার সবাই অবাক হয়ে গেল সাদা দেয়ালের ওপর একটা কালো ছাপ দেখে। ঠিক যেন একটা কালো বেড়াল। গলায় দড়ির ফাঁস।

একরাতেই ফকির হয়ে গেলাম আমি। কালো বেড়ালের স্মৃতি ভোলার জন্যে আবার একটা বেড়ালের খোঁজে ঘুরতে লাগলাম সমাজের নিচু তলায়। একদিন একটা মদের আড্ডায় দেখতে পেলাম এমনি একটা বেড়াল। বসেছিল পিপের ওপর–অথচ একটু আগেও জায়গাটা শূন্য ছিল। অবিকল পুটোর মতোই বড়ো, মিশমিশে কালো। শুধু বুক ছাড়া। সেখানটা ধবধবে সাদা।

বেড়ালটার মালিকের সন্ধান পেলাম না। তবে আমি গায়ে হাত দিতেই যেন আদরে গলে গেল সে। বাড়ি নিয়ে আসার পরের দিন সকাল বেলা লক্ষ্য করলাম–একটা চোখ নেই।

সেই কারণেই আরো বেশি করে আমার বউ ভালোবেসে ফেলল নতুন বেড়ালকে। মনটা ওর নরম। মমতায় ভরা, তাই।

যা ভেবেছিলাম, আমার ক্ষেত্রে ঘটল কিন্তু তার উল্টো। ভালোবাসা দূরের কথা–দিনকে দিন মনের মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণা জমা হতে লাগল নতুন বিড়ালের প্রতি। কোত্থেকে যে এত হিংসা বিদ্বেষ রাগ মনে এল বলতে পারব না।

বেড়ালটার আদেখ্যেতাপনাও বাড়ল তালে তাল মিলিয়ে। যতই মাথায় খুন চাপতে লাগল আমার ওর প্রতি–ততই আমার গায়ে মাথায় কোলে চাপার বহর বেড়ে গেল হতভাগার। প্রতিবারেই ভাবতাম, দিই শেষ করে। সামলে নিতাম অতি কষ্টে।

বউ কিন্তু একটা জিনিসের প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত আমার। তা হলো কালো বেড়ালের সাদা বুক। পুটোর সঙ্গে তফাৎ শুধু ঐ জায়গায়। সাদা ছোপটা দেখতে অবিকল ফাঁসির দড়ির মতো!

একদিন পুরোনো বাড়ির পাতাল ঘরে গেছি বউকে নিয়ে। অভাবের তাড়নায় না গিয়ে পারতাম না। ন্যাওটা বেড়ালটা পায়ে পায়ে আসছে। পায়ে পা বেঁধে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম নিজেকে। কিন্তু সামলাতে পারলাম না মেজাজ। ধাঁ করে একটা কুড়াল তুলে নিয়ে নিশানা করলাম হতচ্ছাড়া বেড়ালের মাথা–বাধা দিল আমার বউ।

বউ বাধা না দিলে সেদিনই দফারফা হয়ে যেত নতুন বেড়ালের। কিন্তু সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বউয়ের ওপর। অমানষিক রাগ। কুড়ালটা মাথার ওপরে তুলে বসিয়ে দিলাম ওর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল স্ত্রী।

সমস্যা হলো লাশটা নিয়ে। অনেক ভেবে চিন্তে দেওয়ালের মধ্যে রক্ত মাখা দেহটা খাড়া করে দাঁড় করিয়ে ইট দিয়ে গেঁথে ফেললাম। প্লাস্টার করে দিলাম। বাইরে থেকে ধরবার কোনো উপায় রইল না।

বড় শান্তিতে ঘুমালাম সে রাত্রে বেড়াল ছাড়া। কুড়াল নিয়ে খুঁজে ছিলাম তাকে বধ করার জন্যে–পাইনি।

দিন কয়েক পরে পুলিশ এসে সারা বাড়ি খুঁজল। আমি সঙ্গে রইলাম। একটুকুও বুক কাঁপল না। চার চারবার নিয়ে গেলাম পাতাল কুঠরির সেই দেওয়ালের কাছে।

তারপর যখন হতাশ হয়ে ওরা চলে যাচ্ছে, বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়লাম আমি। হাতের পাটি দিয়ে খটাস করে মারলাম দেওয়ালের ঠিক সেইখানে যেখানে নিজের হাতে কবর দিয়েছি বউকে।

.

আচমকা একটা বিকট কান্নার আওয়াজ ভেসে এল ভেতর থেকে। সারা বাড়ি গমগম করতে লাগল সেই আওয়াজে। দেখলাম, আমার মরা বউয়ের মাথার ওপর বসে রয়েছে সেই কালো বেড়ালটা, যার বুকের অংশটা সাদা!

# ভৌতিক ক্রিসমাস

আমি আগে কখনো একাকী কাটাইনি ক্রিসমাস।

সাজানো গোছানো কামরায় একা একা বসে থাকতে আমার গা কেমন ছমছম করে। মাথায় যত রাজ্যের ভূত প্রেতের চিন্তা এসে ভিড় করে, মনে হয় রুমের মধ্যে কারা যেন কথা বলছে। অতীতকাল থেকে আসা মানুষজন। কেমন দম বন্ধ করা একটা অনুভূতি হয় আমার ফেলে আসা সবগুলো ক্রিসমাসের স্মৃতি জট পাকিয়ে যায় মনের মধ্যে : শিশুতোষ ক্রিসমাস, বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন, জানালার ধারে গাছ, পুডিংয়ের মধ্যে পুরে রাখা ছয় পেন্সের মুদ্রা এবং কালো আকাশ ঘেরা সকালের ক্রিসমাস; কৈশোরের ক্রিসমাস, বাবা-মায়ের সঙ্গে। যুদ্ধ, হাড় কাঁপানো শীত। দেশের বাইরে থেকে

আসা চিঠিপত্র; বড়ো হয়ে ওঠার পরের ক্রিসমাস; প্রেমিকের সঙ্গে তুষারপাত, যাদুকরী মোহ, রেড ওয়াইন, চুম্বন এবং মাঝরাতের আগে অন্ধকার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি, বরফ পড়ে ধবধবে সাদা জমিন, কালো আকাশের পটভূমে ফুটে থাকা নক্ষত্রের হীরক দীপ্তি কত কত ক্রিসমাসের স্মৃতি বছর ঘুরে।

আর এবারই প্রথম আমার একলা ক্রিসমাস কাটানো।

তবে শুধু একাকীত্বই যে অনুভব করি তা নয়। আরও অনেক লোকই একা একা ক্রিসমাস কাটায় তাদের সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতা অনুভূত হয় মনে। এদের সংখ্যা লক্ষাধিক

তারা অতীত এবং বর্তমানের মানুষ। এরকম একটা অনুভূতি জাগে, চোখ বুজলে মনে হয় অতীত বলে কিছু নেই, ভবিষ্যতের কোনো অস্তিত্ব নেই, শুধু রয়েছে সীমাহীন বর্তমান যার নাম সময় আর এ সময়টুকুই কেবল আমাদের হাতে আছে।

তবু আপনি যতই উন্নাসিক হোন না কেননা, কিংবা ধর্মকর্মে আপনার আগ্রহ না-ইবা থাকুক, ক্রিসমাসের সময় একা থাকলে আপনার কাছে অদ্ভুতই লাগবে।

কাজেই যখন যুবকটিকে আমি দেখলাম ভেতরে ঢুকতে, মনে বেশ স্বস্তি লাগল। তবে এর মধ্যে রোমান্টিক ব্যাপার কিছু নেই–আমি পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই এক নারী, চিরকুমারী স্কুল শিক্ষিকা, গম্ভীর, মাথা ভর্তি কালো চুল, এক সময়ের সুন্দর চক্ষু জোড়া এখন ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন আর যুবকের বয়স কুড়ির কোঠায়, একটু অন্যরকম পোশাক গায়ে, গলায় ওয়াইন কালারের টাই এবং কালো ভেলভেট জ্যাকেট, মাথার বাদামী চুলে কতদিন নাপিতের কাঁচি পড়েনি কে জানে! তার নীল, সরু চোখজোড়ায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, খাড়া নাক, উদ্ধত চিবুক। তবে খুব একটা শক্তিশালী কাঠামো তার নয়। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা।

সে দরজায় কড়া না নেড়েই ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, দুঃখিত। ভেবেছিলাম এটা আমার কামরা। বেরিয়ে যাচ্ছিল, কী মনে করে থমকে গিয়ে ইতস্তত গলায় জানতে চাইল, আপনি কি একা?

হ্যাঁ।

এটা–ব্যাপারটা অদ্ভুত। মানে ক্রিসমাস একাকী কাটানো, তাই না? আমি কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

নিশ্চয় পারো।

সে এসে আগুনের ধারে বসল।

আশা করি আপনি ভাবছেন না আমি কোনো মতলব নিয়ে এখানে এসেছি। আমি সত্যি ভেবেছিলাম এটা আমার রুম, ব্যাখ্যা দিল সে।

তুমি ভুল করেছ বলে আমি খুশি। কিন্তু তোমার মতো তরুণের তো ক্রিসমাসের সময় একা থাকার কথা নয়।

আমি দেশে যেতে পারিনি আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। তাহলে আমার কাজের ক্ষতি হতো। আমি একজন লেখক।

ও আচ্ছা, আমার মুখে হাসি এসে গেল। এরকম অস্বাভাবিক পেশার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল আর এ তরুণটি দেখছি নিজের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। তা তো বটেই, লেখালেখির মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমি চোখ মটকে বললাম।

না, একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু আমার পরিবার বিষয়টি বুঝতে চায় না। তারা কোনটা জরুরি তা-ই জানে না।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে পরিবারের সহায়তা পাওয়া যায় খুব কম।

পাওয়া যায় না বললেই চলে, গম্ভীর গলায় বলল যুবক।

তুমি কী লিখছ?

কবিতা এবং ডায়ারি একযোগে। নাম রেখেছি মাই পোয়েমস অ্যান্ড আই। লেখক ফ্রান্সিস র‍্যাঙ্গেল। এটাই আমার নাম। আমার পরিবার বলে লেখালেখি করে কোনো লাভ নেই। বিশেষ করে এত কম বয়সে। কিন্তু নিজেকে আমি কম বয়সী বলে ভাবি না। মাঝে

মধ্যে নিজেকে বয়োবৃদ্ধ বলে মনে হয়। মনে হয় অনেক কাজ বাকি থাকতেই না আবার মরে যাই।

সৃজনশীলের চাকায় দ্রুত গতি আনতে হবে।

ঠিক তাই। আপনি আসল কথাটি বুঝতে পেরেছেন। আপনি একদিন আমার লেখা পড়বেন। দয়া করে অবশ্যই পড়বেন! তার কণ্ঠে মরিয়ার সুর, চাউনিতে ভয় দেখে আমি বললাম :

ক্রিসমাসের দিনে আমরা বড় বেশি নিরানন্দ আচরণ করছি। তোমার জন্য একটু কফি বানিয়ে আনি? আমি কেক খাব।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। কফি চড়িয়ে দিলাম পারকোলেটরে। তবে আমার কথায় বোধহয় আঘাত পেয়েছিল ছেলেটি, ফিরে এসে দেখি সে চলে গেছে। আমি যারপরনাই হতাশ হলাম।

কফি বানিয়ে রুমটির বইয়ের তাকে চোখ বুলাতে লাগলাম। মোটা মোটা বইয়ের ভলিউম। বাড়িওয়ালি এজন্য আগেই আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলেছিলেন : আশা করি বইপত্রে আপনার বিরাগ নেই, মিস। আমার স্বামী এগুলো ছুঁয়েও দেখেন না আর

বইগুলো রাখবার জায়গাও পাচ্ছি না। এ কারণে এ কামরার ভাড়া আমরা একটু কম নিই।

বইতে আমার বিরাগ নেই, বললাম আমি। বই বরং আমার ভালো বন্ধু।

কিন্তু এ বইগুলোর চেহারাসুরত তেমন বন্ধুসুলভ মনে হচ্ছে না। আমি হাতের কাছে যা পেলাম তা-ই একখানা তুলে নিলাম। নাকি নিয়তিই আমাকে ওই বইটি তুলে নিতে বাধ্য করেছে?

কফিতে চুমুক দিতে দিতে আর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আমি জীর্ণ চেহারার পাতলা বইটি পড়তে লাগলাম। এটির প্রকাশনাকাল ১৮৫২ সালের বসন্ত। মূলত কবিতার বই- কাঁচা হাতের লেখা তবে পরিচ্ছন্ন। তারপর দেখি ডায়ারির ঢঙে কিছু লেখাও রয়েছে। কৌতূহল নিয়ে ওতে চোখ বুলালাম। শুরুতেই লেখা ক্রিসমাস, ১৮৫১। আমি পড়তে লাগলাম :

আমার প্রথম ক্রিসমাস দিনটি কাটল একাকী। তবে আমার একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। হাঁটাহাঁটি শেষে আমি যখন আমার লজিং হাউজে ফিরেছি, এক মধ্যবয়স্ক মহিলাকে দেখতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছি বোধহয় ভুল করে ভুল কামরায় প্রবেশ করেছি। কিন্তু তা নয়। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার মনে হয় উনি ভূত ছিলেন। তবে আমি ভয় পাইনি। ওনাকে আমার

বেশ পছন্দ হয়েছিল। তবে আজ রাতে আমার শরীরটা কেনো জানি ভালো লাগছে না। একদমই ভালো লাগছে না। এর আগে কোনোদিন ক্রিসমাসের সময় আমি অসুস্থ হইনি।

বইয়ের শেষ পাতায় প্রকাশকের একটি নোট রয়েছে :

ফ্রান্সিস র‍্যাণ্ডেল ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ক্রিসমাসের রাতে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বরণ করেন। এ বইতে যে ভদ্রমহিলার কথা বলা হয়েছে তিনিই ওকে সর্বশেষ জীবিত দেখেন। তাঁকে সামনে আসার আহ্বান জানালেও তিনি কোনোদিনই তা করেননি। তাঁর পরিচয় রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

# মৃত্যুকূপ

ব্যারামে ধুঁকছিলাম। মরতে বসেছিলাম। যন্ত্রণায় মনের ভেতর পর্যন্ত মোচড় দিচ্ছিল। ওরা যখন আমার বাঁধন খুলে দিয়ে উঠে বসার অনুমতি দিল–মনে হলো, এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবো। প্রাণদন্ডের হুকুমটুকুই কেবল শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর সব শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে বিচারকের ঠোঁটের রঙ দেখতে পেয়েছিলাম। সাদা হয়ে গেছে। নারকীয় নিপীড়নের এই দন্ড তাদের মুখ দিয়ে বের করতে গিয়েই অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। আমার তাহলে কী হবে। জ্ঞান হারালাম তারপরেই।

পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার আগে আবছা একটা অনুভূতি মন আর শরীরের ওপর অসহ্য চাপ সৃষ্টি করেছিল। সব মনেও করতে পারছি না। বড়ো অস্পষ্ট। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ড যেন ফেটে যাচ্ছিল।

চোখ খুলিনি এতক্ষণ। তবে বুঝতে পারছিলাম, শুয়ে আছি চিৎ হয়ে। বাঁধন নেই। হাত বাড়ালাম। শক্ত আর ভিজে মতো কী যেন হাতে ঠেকল। কী হতে পারে জিনিসটা, এই ভাবনাতেই কয়েক মিনিট কাটিয়ে দিলাম। চোখ মেলার সাহস হলো না।

এক ঝটকায় দুচোখের পাতা খুলে ফেললাম আর সইতে পারলাম না বলে। নিঃসীম অন্ধকার। পাতাল কারাগার নিশ্চয়। মেঝে তো পাথরের।

তবে কি আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে গেল? নিদারুণ ভয়ে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। দুহাত সামনে বাড়িয়ে টলেটলে গিয়েছিলাম। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সমাধি গহ্বরের দেওয়াল তো হাতে ঠেকবে।

ঠেকেছিল হাতে। পাথরের দেওয়াল নিশ্চয়। মসৃণ, হড়হড়ে, ঠান্ডা। হাত বুলিয়ে একপাক ঘুরে এসেছিলাম। প্রতি পদক্ষেপে গা শিরশির করে উঠেছিল। টোলোভো-র এই পাতাল কারাগারের অনেক গা-হিম-করা গল্পামাথায় ভিড় করে আসছিল। তাই পা টিপে টিপে অনেকক্ষণ যাওয়ার পর মনে হলো, গোল হয়েই ঘুরছি দেওয়াল ধারে।

কিন্তু শুরু করেছিলাম কোত্থেকে? পকেট হাতড়ালাম। ছুরিটা নেই। আমার নিজের জামাকাপড় নেই। আলখাল্লার মতো কী একটা পরিয়ে রেখেছে–অজ্ঞান অবস্থায় টের পাইনি। ছুরিটা থাকলে দেওয়ালের খাঁজে খুঁজে রেখে একপাক ঘুরে এসেই বুঝতে পারতাম–শুরু করেছিলাম কোথা থেকে।

আলখাল্লা থেকে একটা লম্বা উল টেনে নিলাম। বিছিয়ে রাখলাম মেঝের ওপর দেওয়াল থেকে একটু লম্ব ভাবে। মেঝেতে পা রগড়ে রগড়ে এক পাক ঘুরে আসতেই পা ঠেকল উলে।

কিন্তু-ক-পা হাঁটলাম? এমন কাহিল বোধ করছি যে মাথাও ঠিক রাখতে পারছি না। স্যাঁতসেঁতে হড়হড়ে মেঝের ওপর দিয়ে আবার পা রগড়ে এগোতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম। পড়েই রইলাম–এত অবসন্ন। ঘুমিয়ে পড়লাম ওই ভাবেই।

ঘুম ভাঙার পর আবার দেওয়াল ধরে টহল দেওয়া শুরু করলাম। মুখ থুবড়ে পড়ার আগে আটচল্লিশবার পা ফেলেছিলাম–এখন বাহান্নবার পা ফেলেই উলের ওপর এসে গেলাম। তার মানে, কারাগারের বেড় একশ পা। অর্থাৎ পঞ্চাশ গজ তো বটেই। তবে আকৃতিটা কীরকম, তা বুঝতে পারলাম না। হাত বুলানোর সময়ে অবশ্য অনেকগুলো কোণে হাত ঠেকেছিল। তা থেকে পাতাল-সমাধির আকার ধারণায় আনা যায়নি।

এই যে এত গবেষণা করে যাচ্ছিলাম, এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল সামান্য–আশা ছিল না একেবারেই। তবে একটা আবছা কৌতূহল আমাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নিরন্ধ্র এই তমিস্রার মধ্যে। প্রথম-প্রথম খুব হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলেছিলাম। কেন না, মেঝে তো শ্যাওলা হড়হড়ে রীতিমতো বিশ্বাসঘাতক। যদিও শক্ত মেঝে, তবুও পা ফেলতে ভয় হয়।

তারপর অবশ্য ভয় কেটে গিয়েছিল। ফটাফট পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলাম–মতলব সমাধি গহ্বরের ব্যাস কতখানি, তা হেঁটে দেখে নেব। তাই আড়াআড়িভাবে হাঁটছিলাম সীমাহীন আঁধার ভেদ করে। দশ বারো পা এই ভাবে যাওয়ার পরেই, আলখাল্লা থেকে টেনে ছিঁড়ে নেওয়া উলের খানিকটা পায়ে জড়িয়ে যাওয়ায়, হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম কঠিন শিলার ওপর।

ধড়াম করে আচমকা আছাড় খেয়েছিলাম বলেই চমকে দেয়ার মতো পরিস্থিতিটা সেই মুহূর্তে খেয়াল করতে পারিনি। সেকেন্ড কয়েক ওইভাবে মুখ থুবড়ে ধরাশায়ী থাকার পর ব্যাপারটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

ব্যাপারটা এই। আমার চিবুক কারাগারের পাথুরে মেঝেতে ঠেকে আছে ঠিকই, কিন্তু ঠোঁট আর মুখের ওপর দিকের অংশ কিছুই স্পর্শ করছে না। যদিও মনে হচ্ছে, থুতনি থেকে বেশ উঁচুতেই রয়েছে এরা-অথচ ছুঁয়ে যাচ্ছে না কিছুই। একই সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন কপালে এসে লাগছে পাকের। বাষ্প–নাকে ভেসে আসছে পচা ফাঙ্গাসের অদ্ভুত গন্ধ।

দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সামনে–শিউরে উঠেছিলাম তৎক্ষণাৎ। আমি মুখ থুবড়ে পড়েছি একটা গহ্বরের কিনারায়। সে গহ্বরের তলদেশ কোথায়, তা তো জানিই না–গোলাকার গহ্বরের পরিধি কতটা, তাও বোঝবার উপায় আমার নেই। কিনারার ধার থেকে হাতড়ে হাতড়ে এক টুকরো পাথর খসিয়ে এনে ফেলে দিয়েছিলাম গহ্বরের মধ্যে। গহ্বরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে পাথরের টুকরো বেগে নেমে গিয়েছিল পাতাল-প্রদেশে–ধাক্কার শব্দ আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে এনে আছাড় দিয়ে দিয়ে ফেলে গিয়েছিল কানের পাতায়। তারপর পাথর নিজেই চাপা শব্দে গোত খেয়েছিল জলের মধ্যে–প্রবলতর প্রতিধ্বনি গুমগুম শব্দে ধেয়ে এসেছিল ওপর দিকে।

একই সঙ্গে আচমকা একটা শব্দ ভেসে এসেছিল মাথার ওপর দিক থেকে। ঠিক যেন একটা দরজা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। চকিতের জন্য আলোর রেখা নিরন্ধ্র আঁধারকে চমকিত করে দিয়ে আঁধারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী ধরনের মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল আমার জন্য; তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। নিজের গলার আওয়াজ শুনেও তখন চমকে উঠেছিলাম। দুধরনের মৃত্যুর ব্যবস্থা আছে শুনেছিলাম এই ভূগর্ভ কারাগারে। প্রথমটা নিষ্ঠুর নির্যাতন সইতে না পেরে যেন তিল তিল করে মরতে হয়। দ্বিতীয়টা আরও ভয়াবহ; আমাকে এই দ্বিতীয় মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল। আমার কপাল ভালো। তাই আর এক পা এগোইনি। মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম বলেই গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাইনি।

আতঙ্কে আমার প্রতিটি স্নায়ু থরথর করে কেঁপে উঠেছিল নারকীয় গহ্বরের তলিয়ে যাওয়ার পরের অবস্থাটা কল্পনা করতে গিয়ে। নিপীড়নের আরও অঢেল ব্যবস্থা নিশ্চয় মজুদ রয়েছে গহ্বরের তলদেশে–বেঁচে গেছি ভাগ্য সহায় হয়েছিল বলে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠক ঠক করে কাঁপছিল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কীভাবে যে হাতড়ে হাতড়ে পাথুরে দেওয়ালের পাশে ফিরে এসেছিলাম, তা শুধু আমি জানি আর ঈশ্বর জানেন।

পণ করেছিলাম, এই দেওয়ালের আশ্রয়েই থাকব এখন থেকে। মরতে হয় এখানেই মরব–নিতল গহ্বরের আতঙ্কঘন তলদেশে আছড়ে পড়ার চেয়েও তা শতগুণে শ্রেয়। যেহেতু গহ্বরের তলায় কী আছে তা জানি না–তাই অজানা বিভীষিকার কল্পনা ডালাপালা মেলে ধরে পঙ্গু করে তুলল আমার মস্তিষ্ককে। না জানি এই কারাগারের নানা দিকেই এই ধরনের আরও কত কুৎসিত আর বীভৎস মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখে দিয়েছে অমানুষ জল্লাদরা। আমার মনের অবস্থা তখন যদি অন্য রকম হতো, তাহলে বোধহয় গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েই সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে দিতাম। সেটাও যে সহজতর হতো–সে ভাবনাও কুরে কুরে খাচ্ছিল মাথার কোষগুলোকে। কেনো, আমি তো শুনেছি, এই পাতাল-কারাগারের যাদের আনা হয়–নিমেষ মৃত্যু তাদের কপালে লেখা থাকে না, এদের পৈশাচিক প্ল্যানই হলো একটু একটু করে মানরা কয়েদীকে প্রক্রিয়াগুলো শুনলেও নাকি গায়ের রক্ত পানি হয়ে যায়। নিদারুণ উত্তেজনায় জেগেছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর ঘুম নামল চোখে। ঘুম ভাঙার পর হাতের কাছেই পেলাম এক জগ জল আর এক টুকরো রুটি। প্রথমবার যখন ঘুমে বেহুশ হয়েছিলাম, তখনও এই দুটো জিনিস পেয়েছিলাম ঘুম ভাঙার পরেই। এখনও কেউ এসে রেখে গেছে আমাকে ঘুমে অচেতন দেখে–আড়াল থেকে তাহলে দেখছে আমার মৃত্যু যন্ত্রণা! পিশাচ কোথাকার!

ক্ষিদের চোটে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে নিয়েছিলাম রুটি, ঢকঢক করে খেয়েছিলাম পানি। তারপরেই আশ্চর্য ঘুম নামল দুচোখে। নিশ্চয় ঘুমের আরক শিােনো ছিল পানিতে। ঘুমালাম তাই মড়ার মতো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, বলতে পারবো না। তবে ঘুম যখন উড়ে গিয়েছিল চোখের পাতা থেকে–তখন আশপাশের দৃশ্য আর ততটা অদৃশ্য থাকেনি।

যেন গন্ধক-দ্যুতির মধ্যে দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল প্রতিটি বস্তু। বিচিত্র এই প্রভাব উৎস কোথায়, প্রথমে তা ঠাহর করতে পারিনি–কেননা আমি তখন আবিষ্ট হয়ে দেখছিলাম কারাগারের চেহারা।

ভুল করেছিলাম কারাগারের সাইজের আন্দাজি হিসেবে। দেওয়ালের পরিধি পঁচিশ গজের বেশি হবে কোনমতে। ছোটো হলেও পরিত্রাণের পথ যখন নেই, তখন খামোখা তা নিয়ে আর ভেবে লাভ কী। তাই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোর দিকে কৌতূহল জাগ্রত করেছিলাম। পরিধির মাপে হিসাব ভুল করেছিলাম কীভাবে, তাও বুঝেছিলাম।

প্রথমবারে প্রায় এক চক্কর ঘুরে এসে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম উলের কয়েক পা দূরেই। তারপর টেনে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠেই আবার উলটোদিকে হেঁটেছিলাম। ঘুমের ঘোরে বাঁ দিকে না গিয়ে ডানদিকে হেঁটেছিলাম। তাই দ্বিগুণ মনে হয়েছিল গহ্বরের বেড়।

কারাগারের আকৃতি নিয়েও ভুল ধারণা করেছিলাম। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে (ঘুমের ঘোরে) যেগুলোকে কোণ বলে মনে হয়েছিল–আসলে তা খাঁজ। অজস্র খাঁজকাটা দেওয়াল। দেওয়াল ঢুকে রয়েছে এই সব খাজের মধ্যে। অন্ধকারে তাই মনে হয়েছিল, দেওয়াল বুঝি গোল হয়ে ঘুরে গেছে। এখন আর সে বিভ্রান্তি নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ঘরটা চৌকোনা। দেওয়ালও পাথর দিয়ে তৈরি নয়। লোহা বা অন্য কোনো ধাতু দিয়ে গড়া। অজস্র কিম্ভূত ছবি আঁকা রয়েছে চার দেওয়ালেই। কুসংস্কারে ডুবে থাকা মঠের

সন্ন্যাসীদের মগজ থেকেই কেবল এরকম উদ্ভট কল্পনার আকৃতি সম্ভবপর হয়। প্রতিটি মূর্তিই অপার্থিব, অমানুষিক, পৈশাচিক–কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেই মাথার মধ্যে ঘোর লেগে যায়–রক্ত হিম হতে শুরু করে। যদিও পাতালের স্যাঁৎসেঁতেনির জন্যে বিদঘুঁটে আকৃতিদের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে–বিকট অবয়বগুলোও আর তেমন স্পষ্ট নয়। তা সত্ত্বেও যা দেখতে পাচ্ছি ওই অপার্থিব আলো যার মধ্যে দিয়ে–তার প্রতিক্রিয়াতেই তো আমার মাথার চুল খাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

পাথুরে মেঝের ঠিক মাঝখানে রয়েছে পাতাল কূপ। গোটা ঘরে গহ্বর ওই একটাই। গোলাকার।

আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি একটা কাঠের কাঠামোর ওপর। ঘুমে অচেতন থাকার সময়ে আমাকে এই অবস্থায় আনা হয়েছে। মজবুত পাটি দিয়ে এই কাঠামোর সঙ্গে আমাকে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বেরিয়ে আছে শুধু মুন্ডু আর বাঁ হাতের একটুখানি–যাতে কষ্টেসৃষ্টে হাত বাড়িয়ে মাটির থালায় রাখা মাংস টেনে নিয়ে মুখে পুরতে পারি।

পানির জগ উধাও। ভয়ানক ব্যাপার সন্দেহ নেই। কারণ, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তেষ্টা আরও বাড়বে ওই মাংস খেলে–কারণ ওতে প্রচুর ঝালমশলা চর্বি দেওয়া হয়েছে পিপাসা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। অথচ জল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যন্ত্রণা সৃষ্টির আর এক পরিকল্পনা! কশাই কোথাকার!

এরপর তাকিয়েছিলাম কারাগার-কক্ষের কড়িকাঠের দিকে। প্রায় তিরিশ চল্লিশ ফুট ওপরে দেখতে পাচ্ছি ধাতুর চাদর দিয়ে মোড়া সিলিং–দেওয়াল চারটে যেভাবে তৈরি, প্রায় সেইভাবে। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটাই জিনিস। মহাকালের একটা প্রতিকৃতি। তবে গতানুগতিক কাস্তে নেই হাতে। তার বদলে রয়েছে একটা দোলক। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। দোলকটা যেন একটা ক্ষুরধার কাস্তে। ঠায় চেয়েছিলাম বলেই মনে হয়েছিল, শাণিত কাস্তে যেন অল্প অল্প দুলছে। চোখের ভুল ভেবে আরও খুঁটিয়ে চেয়েছিলাম। এবার আর ভুল বলে মনে হয়নি। কাস্তে-দোলক সত্যিই দুলছে। খুব আস্তে। চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকিয়েছিলাম দেওয়ালের অন্যান্য দৃশ্যের দিকে।

খুটখাট খড়মড় আওয়াজ শুনেই চোখ ঠিকরে এসেছিল মেঝের দিকে। ডানদিকের কোনো গর্ত থেকে পালে পালে ধেড়ে ইঁদুর আগুন-রাঙা বুভুক্ষু চোখে ধেয়ে আসছে মাংসখন্ডর দিকে। অতি কষ্টে খাবার বাঁচালাম শয়তানদের ধারালো দাঁতের খপ্পর থেকে। তাড়িয়েও দিলাম কুচুটে করাল প্রাণি বাহিনীকে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে (একঘণ্টাও হতে পারে–সময়ের হিসেব রাখার কোনো উপায় তো ছিল না), ওপরে সিলিং-এর দিকে চাইতেই খটকা লেগেছিল। স্পষ্ট দেখলাম, পেন্ডুলাম আরও বেশি দুলছে–প্রায় গজখানেক জায়গা জুড়ে দুলেই চলেছে। হতভম্ব হলাম (ভয়ার্তও হলাম) পেন্ডুলামের চেহারা দেখে। নিচের দোলকটা একটা ভারি ক্ষুরের মতো ধারালো কাস্তে ছাড়া কিছুই নয়। দুপাশের শিংয়ের মতো উঁচু হয়ে থাকা অংশ দুটোর নিচের দিকে মস্ত দোলকটার নিচের অংশ বাঁকানো ফলক-যা বাতাস কেটে আসছে

যাচ্ছে–সাঁ সাঁ শব্দে। রক্ত হিম হয়ে গেল আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে। শাণিত এই দোলক বেশ খানিকটা নিচেও নেমে এসেছে!

পিশাচসম ঘাতকরা তাহলে আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারার নতুন প্ল্যান এঁটেছিল। এ গহ্বরে যাদের আটক রাখা হয়, তাদেরকে মারা হয় তিল তিল করে–এটা আমি জানি। ওরা তাই কুয়োয় নিজেরাই ছুঁড়ে দেয়নি—আমাকে-ভেবেছিল আমিই হেঁটে গিয়ে ঢুকে যাব নিঃসীম অন্ধকারে আমার সেই পতন-দৃশ্য দেখার জন্যেই ওপরের দরজা ফাঁক করেছিল নিমেষের জন্যে। যখন দেখল, কপাল জোরে বেঁচে গেছি–তখন আয়োজন হয়েছে আর এক মানসিক অত্যাচারের। ধারালো দোলকের দুলে দুলে নেমে আসা! অমানুষ না হলে এমন অভিনব ফন্দী কারও মাথায় আসে!

কত ঘণ্টা, কত দিন যে এই নির্মম মানসিক ধকল সয়ে গিয়েছিলাম, সে হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। সভয়ে বিস্ফারিত চোখে শুধু দেখেছিলাম, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দুলে দুলে, রক্তলোলুপ খড়গ নেমে আসছে নিচের দিকে। নামতে নামতে এসে গিয়েছিল বুকের এত কাছে। যে, ইস্পাতের গন্ধ ভেসে আসছিল নাকে।

দমকে দমকে, এক এক ঝটকান দিয়ে, ধারালো খড়গ আমার নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গেছে ইস্পাতের শীতল গন্ধ–মৃত্যুর হাতছানি প্রকট হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে। নির্মিশেষে সেই দুলন্ত মৃত্যুদূতকে ঘণ্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন দেখতে দেখতে সহসা আমি

সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে শিথিল হয়ে পড়েছিলাম। আসন্ন ঝকমকে মৃত্যুকে দেখে অকস্মাৎ প্রশান্তির ঢল নেমেছিল আমার প্রতিটি রক্তকণায়।

বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আর কোনো খেয়াল ছিল না। মর্মান্তিক যাতনা থেকে মুক্তি পেয়েছি দেখে অন্তরালের পিশাচ ঘাতকরা নিশ্চয় মুষড়ে পড়েছিল। তাই পেন্ডুলামের দুলুনিও বন্ধ করে রেখেছিল। কতখানি বিকট কুটিল মন থাকলে এইভাবে হত্যা করার ইচ্ছেটা হয়, সে ভাবনারও। আর সময় পাইনি; কেননা, খড়গ-দোলক আবার দুলতে শুরু করেছিল। আবার সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কেটে আমার বুকের ঠিক ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল লৌহ-কারাগারের এদিক থেকে সেদিকে–প্রায় তিরিশ ফুট জায়গা জুড়ে অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে দুলুনি...নামছে একটু একটু... লক্ষ্যস্থল আমার বুকের মধ্যপ্রদেশ।

এ অবস্থায় ক্ষিদে তেষ্টা উড়ে যাওয়ার কথা। আমার কিন্তু পেট চুঁইয়ে উঠেছিল। বাঁ হাত বাড়িয়ে মাংসের টুকরো ধরে মুখের কাছে টেনে এনেছিলাম। ইঁদুর শয়তানরা বেশির ভাগই খেয়ে গেছে। খেতে গিয়েও বিদ্যুতের মতোই একটা বুদ্ধি ঝলসে উঠেছিল মাথার মধ্যে। ক্ষীণ আশার প্রদীপ টিমটিম করে উঠেছিল মগজে। স্নায়ুমন্ডলী বুঝি নৃত্য করে উঠেছিল এই আশার স্নান আভায়। কাঠ হয়ে পড়ে থেকে ছলছল করে দেখে গিয়েছিলাম খড়গের আনাগোনা

ডানে বাঁয়ে...ডানে বাঁয়ে...দুলে দুলে বাতাস কেটে কেটে লোলুপ খড়্গ নামছে শনৈঃ শনৈঃ...তালে তালে আমি অট্টহাসি হাসছি উন্মাদের মতো–কখনো হুঙ্কার দিচ্ছি বিকৃত উল্লাসে...।

নামছে...নামছে...রক্তপিপাসু খড়্গ নামছে তো নামছেই...বিরামহীন ছন্দে নির্ভুল লক্ষ্যে নেমে আসছে আমার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে...এসে গেছে ইঞ্চি তিনেক ওপরে...আর একটা নেমে এসে প্রথমেই কাটবে আমার আলখাল্লা...আলখাল্লার ওপর আছে পাটির বাঁধন...একটাই পাটি দিয়ে পেঁচিয়ে বাধা হয়েছে কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে...এক জায়গা কেটে গেলেই বাঁ হাত দিয়ে টেনে সমস্ত বাঁধন খসিয়ে ফেলতে পারব? আশা আমার সেটাই। কিন্তু...পটি বুকের ওপর আছে তো? খড়্গের ফলক বুকের যেখানটা আগে স্পর্শ করবে– পাটি কি সেখানে আছে? মাথা উঁচু করে দেখেছিলাম বুক। নেই। পাটি নেই বুকের ঠিক সেই জায়গায়! পাটি আছে আশপাশে-খড়্গ যেখানে বুক কাটবে- সেই জায়গায় রাখা হয়নি পটির ফাস।

ইঁদুরের দল তখন আমাকে হেঁকে ধরেছে। কনুই পর্যন্ত বাঁ হাত আলগা করে এতক্ষণ মাটির থালার ওপর হাত নেড়ে নেড়ে ওদের ঠেকিয়ে রাখছিলাম। একটু একটু করে বেপরোয়া হয়ে উঠছিল বুভুক্ষুর দল। রক্তরাঙা চোখে ধারালো দাঁত দেখিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আমার হাতের ওপর। আঙুলে কামড় বসিয়ে টুকরো টুকরো খেয়ে যাচ্ছিল থালার মাংস। মাংস আর নেই এখন। আছে শুধু চর্বি। আচমকা আবার আশার বিজলী চাবুক মেরে চালু করে দিয়েছিল আমার ভয়-নিস্তেজ মগজকে। হাত বাড়িয়ে চর্বি তুলে

নিয়ে মাখিয়ে দিয়েছিলাম পটিতে। তারপর হাত রেখেছিলাম বুকের ওপর। শুয়েছিলাম মড়ার মতো নিস্পন্দ দেহে। আকুল প্রতীক্ষায় নিঃশ্বাস ফেলতেও বুঝি ভুলে গিয়েছিলাম।

সহসা আমি নিশ্চল হয়ে যেতে নিশ্চয় ধোঁকায় পড়েছিল মাংসলোভী ইঁদুর বাহিনী। রান্না মাংস ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমার কাঁচা মাংস তো রয়েছেই। এরকম কাঁচা নরমাংস এর আগেও ওরা অনেক খেয়েছে। কিন্তু আমি যে এখনো মরিনি, অথচ চুপচাপ শুয়ে রয়েছি–হাতও নাড়ছি না–এই অবস্থাটা বুঝতেই যেটুকু সময় ওরা নিয়েছিল। তারপরেই ডাকাবুকো দু-একটা বেড়ে ইঁদুর গন্ধে গন্ধে উঠে এসে দাঁত বসালো চর্বি মাখা পাটিতে।

দেখাদেখি এল বাকি সবাই। দেখতে দেখতে ঝাঁকে ঝাঁকে ছেয়ে ফেলল আমার সর্বাঙ্গ। হেঁটে গেল আমার গলার ওপর দিয়ে ঠোঁট মেলালো আমার ঠোঁটের সঙ্গে। কী কষ্টে যে নিজেকে ওই পূর্তিগন্ধময় বিবরবাসীদের সান্নিধ্যে রেখেও স্থির হয়েছিলাম, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

সুচতুর শয়তানের দল নখর বসিয়ে বসিয়ে আমার চোখ মুখ, কান, গলা, পা হাত দিয়ে হেঁটে গেলেও বুকের ঠিক যেখানে খড়গের কোপ নেমে আসছে–পা দিল না সেখানে। টের পেলাম পাটির নানান জায়গায় কুট কুট করে দাঁত বসছে...পাটি খসেও পড়ছে নানান জায়গায়–তবুও আমি নড়লাম না...জোরে নিঃশ্বাস ফেললাম না–অমানষিক প্রচেষ্টায় নিজেকে নিশ্চল রেখে দিলাম।

খড়গ কিন্তু ইতিমধ্যে আরও নেমে এসেছে। আলখাল্লা কেটে কেটে যাচ্ছে। স্নায়ুর মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম চামড়ায় পরশ বুলিয়ে যাওয়ার। বাঁ হাতের এক ঝটকায় ফেলে দিলাম সমস্ত ইঁদুর। খচমচ শব্দে হটে গেল হতচকিত বিবরবাসীরা। অতি সন্তপর্ণে একপাশে সরে গিয়ে খসিয়ে নিলাম একটার পর একটা বাঁধন। তারপর একেবারেই গেলাম কাঠের ফ্রেমের বাইরে। খড়গের কোপ থেকে এখন আমি অনেক দূরে। আমি মুক্ত! সাময়িক হলেও স্বাধীন!

স্বাধীন হলেও খুনিগুলোর খপ্পর থেকে এখনও কিন্তু নিস্কৃতি পাইনি। তা সত্ত্বেও বিপুল উল্লাসে অট্টহাসি হেসে যখন নৃত্য করছি পাষাণ কারাগারে, ঠিক সেই সময়ে স্তব্ধ হলো মারণ-দোলকের দুলুনি–অদৃশ্য এক শক্তি তাকে টেনে তুলে নিল সিলিং-এর কাছে। এই দেখেই চরম শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল আমার। নরকের পিশাচগুলো তাহলে আড়াল থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছিল আমার প্রতি মুহূর্তের মরণাধিক যন্ত্রণা!

এ স্বাধীনতা তাহলে টিকবে কতক্ষণ? একটার পর একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সরিয়ে দিচ্ছি–পরক্ষণেই ততোধিক যন্ত্রণার যন্ত্র হাজির করছে পিশাচ-হৃদয় বিচারকরা। নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়ে জুল জুল করে তাকিয়ে ছিলাম চারপাশের চার দেওয়ালের দিকে। প্রথমে যা টের পাইনি–এখন তা শিহরণের ঢেউ তুলে দিয়ে গেল আমার প্রতিটি স্নায়ুর ওপর দিয়ে।

বিচিত্র একটা পরিবর্তন আসছে ঘরের আকৃতিতে। পরিবর্তনটা কী, তা ধরতে পারছি না। কিন্তু তা আঁচ করতে গিয়েই ঠকঠক করে কাঁপছে আমার সর্বাঙ্গ। ভয়ের ঘোরের মধ্যে দিয়ে সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম গন্ধক-দ্যুতির উৎস।

এ আলো আসছে আধ ইঞ্চি ফাঁকা থেকে। চারটে দেওয়াল যেখানে মেঝেতে লেগে থাকার কথা সেখানে রয়েছে আধ ইঞ্চি ফাঁকা; অর্থাৎ চারটে ধাতব দেওয়ালই ঝুলছে মেঝে থেকে আধ ইঞ্চি ওপরে; গন্ধক-দ্যুতি তার অনির্বান আভা নিক্ষেপ করে গেছে এতক্ষণ এই ফাঁকার মধ্যে দিয়ে। ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল বলে সাহস হলো না ফাঁকা দিয়ে উঁকি মেরে ওদিকের দৃশ্য দেখার। তারপর অবশ্য চেষ্টা করেছিলাম। মাটিতে উপুড় হয়ে উঁকি মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি।

উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা দেওয়ালের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগে আবছাভাবে আঁচ করেছিলাম, কোথায় যেন কী পালটে যাচ্ছে। পরিবর্তনের স্বরূপ আন্দাজ করতে গিয়েই অজানা আতঙ্কে প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। এখন স্বচক্ষে দেখলাম সেই পরিবর্তন। আগেই বলেছি, এ ঘরের লোহার দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা কিন্তু উদ্ভট বিদঘুঁটে বীভৎস মূর্তি–তারা কেউই পার্থিব প্রাণি নয়, অদৃশ্য লোকের আততায়ী প্রত্যেকেই তাদের বিকট চেহারা এতক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠেনি রঙ ফিকে হয়ে গিয়েছিল বলে।

এখন সেই নিষ্প্রভ দানবদল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। প্রতিটি রঙের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোটরাগত নারকীয় চোখে দেখা দিয়েছে স্ফুলিঙ্গ।

হ্যাঁ, সত্যিই আগুন লকলকিয়ে উঠছে অবয়ব। দেওয়াল তেতে উঠছে, লাল হয়ে উঠছে, লোহা তেতে লাল হয়ে গেলে ঠিক যা হয়!

জানোয়ার! জানোয়ার! এরা মানুষ না পশু! এভাবেই শেষে নিকেশ করতে চায় আমাকে! দু-দুবার ওদের পাতা মৃত্যুর ফাঁদ টপকে গিয়ে বেঁচে গেছি–তাই এবার চার দেওয়ালের দানবদের লেহিহান করে তুলছে লোহা তাতিয়ে দিয়ে। উৎকট বাষ্পে দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। তীব্র আঁচে চামড়া ঝলসে যাবে মনে হচ্ছে।

উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে আগুনের আঁচ। চার দেওয়ালের দানবদল লোল জিহ্বা আর আগুন চোখ মেলে যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে। দৃষ্টি বিভ্রম নাকি?

আঁতকে উঠলাম পরক্ষণেই ঘরের আর একটা নারকীয় পরিবর্তন দেখে। ঘরটা ছিল চৌকোনা। এখন তা দ্রুত বরফির মতো হয়ে যাচ্ছে বিপরীত দুটো কোণ ছোটো হচ্ছে যে হারে, মুখোমুখী অন্য দুটো কোণ বড়ো হচ্ছে সেই একই হারে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে মেঝের ছোটো হয়ে যাওয়া–সঙ্কীর্ণ হচ্ছে বরফি মেঝে–দুদিক থেকে আগুন রাঙা দেওয়াল আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে....

মাঝের ওই নিতল গহ্বরের দিকে!

হা ঈশ্বর! আর তো পরিত্রাণের পথ নেই। ওরা আমাকে এই কারাগারে এনেছিল একটাই উদ্দেশ্যে–পাতাল-কূপে ফেলে দেবে বলে। দু-দুবার ওদের ফাঁকি দিয়েছি। এবার আর রক্ষা নেই। তেতে-লাল লোহার দেওয়াল বারকয়েক ঘঁাকা দিয়ে ফোঁসকা তুলে গেল গায়ে। দম আটকে আসছে উগ্র কটু গন্ধে। পেছনের দুই দেওয়াল ক্রমশ এগিয়ে এসে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। অতলান্ত ওই বিভীষিকার দিকে...

কুয়োয়

কি আছে ওই কুয়োয়? কেন ওরা আমাকে ওরা ফেলে দিতে চায় কুয়োর গর্ভে? উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে উঁকি মেরেছিলাম তলদেশে। শিহরণের পর শিহরণ ঘূর্ণিপাকের মতো আর্বত রচনা কবে আমাকে ছিটকে সরিয়ে এনেছিল কুয়োর পাড় থেকে।

যা দেখেছি, তা আর যেন ইহজীবনে দেখতে না হয়। আগুনের লাল আভা সিলিং থেকে ঠিকরে গিয়ে প্রদীপ্ত করে তুলেছিল কুয়োর তলদেশ। সেখানে বিরাজ করছে যে বিভীষিকা, তা কল্পনায় আনার ক্ষমতা আছে শুধু নরকের বাসিন্দাদের সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়নি পার্থিব চোখ...করাল ওই বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাই তো বিকৃত করে দেওয়াল পক্ষে যথেষ্ট!

আমি তাই ছিটকে সরে এসেছিলাম পেছনে–পরক্ষণেই তপ্তলৌহ দেয়ালের ছ্যাকা খেয়ে কাতরে উঠে আছড়ে পড়েছিলাম সামনে। পেছানোর আর জায়গা নেই। হয় চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে জ্যান্ত ঝলসাতে হবে–নয়তো পাতাল-কূপের মরণাধিক শৈত্যবরণ করতে নিতে হবে!

আমি যখন টলছি...ঠিক সেই সময়ে যেন সহস্র দামামা ধ্বনিত হলো বাইরে কোথায়...সম্মিলিত কণ্ঠের বজ্ররোষ বুঝি বিদীর্ণ করে দিল দূর গগন...পাষাণ মেঝের ওপর লোহা টেনে নিয়ে যাওয়ার কর্কশ নিনাদে ঝালাপালা হয়ে গেল কানের পর্দা...টলে গিয়ে কুয়োর গর্ভে যখন পড়ে যাচ্ছি–শক্ত হাতে কে যেন আমার বাহুমূল খামচে ধরে টেনে নিয়ে এল মৃত্যু গহ্বরের কিনারা থেকে।

এসে গেছেন জেনারেল লাসালে। টোলাডো দখল করেছে ফরাসি সৈন্য। ব্যর্থ হয়েছে চক্রান্ত!

# রক্তচোষা

রক্তলাল রঙ ছড়িয়ে পাহাড়ের ওপারে ডুব দিচ্ছে সূর্য। ধারাল বাতাসের তাড়া খেয়ে ঝরে পড়া শুকনো পাতাগুলো পশ্চিমে এমনভাবে ধেয়ে যাচ্ছে, যেন সূর্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাচ্ছে ওগুলো।

নিজেকে জড়বুদ্ধির লোক বলে তিরস্কার করল হেনডারসন। থমকে দাঁড়িয়ে মগ্ন হলো ভাবনায়। আঁধার নামতে আর বেশি দেরি নেই। সস্তা কল্পনায় গা ভাসিয়ে কী লাভ?

মাথামোটা? আবার বলল হেনডারসন। চিন্তাটা সম্ভবত দিনের বেলায়ই তার মাথায় আসে, এবং তখন থেকেই সে আনমনা। হ্যালোইনের ভয়াল রাত আজ। পৃথিবীর সব গোরস্থানে জেগে উঠবে মৃতেরা। আত্মাগুলো বেরিয়ে আসবে কবর ছেড়ে।

অন্যান্য দিনের মতোই আরেকটা ঠান্ডা, পচা দিন আজ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেনডারসন। এমন একটা সময় ছিল, আপনমনে ভাবল সে, যখন এ রাত আসা মানেই ছিল ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। অশুভ আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠত গোটা অন্ধকার ইউরোপ। অজানা ক্রুর হাসির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হতো এই সন্ধে। অশুভ দর্শনার্থীদের ভয়ে রুদ্ধ হতো একটার পর একটা দরজা, একান্ত প্রার্থনায় বিভোর হতো অগণিত মানুষ, ঘরে ঘরে জ্বলে উঠত লক্ষ লক্ষ মোম। চিন্তাভাবনায় আঁকাল একটা ব্যাপার ছিল তখন, গভীরভাবে উপলব্ধি করল হেনডারসন। রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ ছিল সেই জীবন। মধ্যরাতের পথচারীরা

সিঁটিয়ে থাকত আতঙ্কে, না জানি কী আছে সামনের বাঁকটায়। ভূত-পিশাচ আর অপদেবতার জগতে বাস করে আত্মাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করত তারা। সে সময় বিশেষ একটা তাৎপর্য ছিল মানুষের আত্মার। এখন দিন বদলেছে। নাস্তিক্য এসে দূরে ঠেলে দিয়েছে আগের সেই ধারনাকে। মানুষ আগের মতো আর শ্রদ্ধা করে না তার আত্মাকে। তবু এই বিংশ শতাব্দীতেও ছাড়া ছাড়া কিছু ঠুনকো বিশ্বাস আঁকড়ে আছে মানুষ, যেগুলো তাদের কল্পনার ডানা মেলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খায়।

বেকুব! অজান্তেই আবার বলে উঠল হেনডারসন। আসলে তার মানব সত্তাকে হটিয়ে দিয়ে ভিন্ন একটা সত্তা ঠাঁই নিয়েছে মাথায়। পাছে প্রেতলোকের ওই জীবগুলো তার গোপন পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলে, এই ভয়ে বার বার নিজেকে ভর্ৎসনা করছে সে। ওদের রক্তচক্ষু ফাঁকি দেয়ার একটা প্রাণপণ চেষ্টা আর কী।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কসটিউমের একটা দোকান খুঁজছে হেনডারসন। জমকালো একটা পোশাক চাই তার। আজ রাতের ছদ্মবেশ-উৎসবে পরতে হবে। দেরি হলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যে হ্যালোইন নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে।

সরু গলির দুপাশে সারি বেঁধে দাঁড়ানো দালানগুলোতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করছে হেনডারসন। আঁধার ক্রমশ ছায়া ফেলছে দালানগুলোর গায়ে। ফোন-বুকে টানা হাতে লেখা ঠিকানাটার দিকে আবার তাকাল সে। কিন্তু আলোর স্বল্পতায় পড়তে পারল না। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল হেনডারসন। সন্ধে নামা সত্ত্বেও হতচ্ছাড়ার দল

দোকানগুলোতে আলো দিচ্ছে না কেনো ? এই দরিদ্র ঘিঞ্জি এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে আসাটাই একটা ঝক্কির ব্যাপার, কিন্তু তবু–

হঠাৎ করেই সেই দোকানটা পেয়ে গেল হেনডারসন। রাস্তার ঠিক ওপারেই। রাস্তা পেরিয়ে দোকানের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সে। উঁকি দিল ভেতরে। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো এসে দালানের কপালে তির্যকভাবে পড়ে সড়াৎ করে নেমে এসেছে জানালা আর ডিসপ্লেতে। চেপে রাখা ধারাল শ্বাসটুকু টেনে নিল হেনডারসন।

একটা কসটিউমের দোকানের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে সে–নরকের কোনো ফাটল দিয়ে নয়। তা হলে ডিসপ্লেটা অমন গনগনে লাল দেখাচ্ছে কেনো? থরে থরে সাজানো মুখোশগুলো কী ভীষণ দেখাচ্ছে এই আলোতে! যেন একদল পিশাচ দাঁত বের করে হাসছে।

গোধূলির রঙ, নিজেকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল হেনডারসন। আসলে মুখোশগুলোর সাজানোর ঢঙই এরকম। তবু গা ছমছম করতে থাকে কল্পনাপ্রবণ লোকটার। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে সে।

জায়গাটা অন্ধকার এবং নীরব। ঘরের বাতাসে একাকীত্বের গন্ধ-যে গন্ধ নিরন্তর বিরাজ করে পৃথিবীর সব সমাধি, গভীর অরণ্য, আর দুর্গম পাহাড়ের গুহায় গুহায়। এবং-ধুশ-শালা! নিজের ওপর আবার রুষ্ট হলো হেনডারসন। আজ কী হয়েছে তার? ফাঁকা

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে হাসল সে। নিজেকে সান্ত্বনা দিল, এটা আর কিছু নয়, কসটিউম-শপের গন্ধ। গন্ধটা তাকে কলেজের সেই শখের নাটকের দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এই ন্যাপথলিন, জীর্ণ পশম, তেল আর রঙের গন্ধের সাথে তার পরিচয় অনেকদিনের। হ্যামলেট নাটকে অভিনয়ের সেই দৃশ্যগুলো মনে করতে করতে অজান্তেই একটা দাঁত কেলানো মাথার খুলি তুলে নিল সে।

সংবিৎ ফিরতেই খুলিটা তার মাথায় চমকপ্রদ একটা ফন্দি যোগাল। এই হ্যালোইনের রাতে অন্য সবার মতো রাজা, তুর্কীবীর কিংবা জলদস্যু সেজে উৎসবে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার। সাধারণ ছদ্মবেশে লিন্ডস্ট্রোন্ডের ওখানে গেলে কেউ তাকে পাত্তাই দেবে না। তা ছাড়া লিন্ডস্ট্রোমও মনঃক্ষুণ্ণ হবে। কারণ তার সোসাইটির বন্ধুরা আসবে দামী পোশাকে ছদ্মবেশ নিয়ে। হেনডারসন অবশ্য লিন্ডস্ট্রোমের ওই কৃত্রিম বন্ধুদের তেমন একটা তোয়াক্কা করে না। আসবে তো সব মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ, আর মণি-মুক্তাখচিত ভারি গহনা পরা রমণীরা। তাদের ভড়কে দিয়ে হ্যালোইনের প্রাণসঞ্চার করতে ভয়ঙ্কর একটা কিছু সাজবে না কেনো সে?

.

অপেক্ষায় থেকে হাঁপিয়ে উঠল হেনডারসন। পেছনের ঘর থেকে আলো নিয়ে আসছে না কেউ। মিনিট কয়েক পর ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে। কাউন্টারে সজোরে হাত চাপড়ে চেঁচাল, কে আছ! এদিকে এসো!

প্রথমে নীরবতা, তারপর অস্পষ্ট একটা নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল পেছনে। কী বিচ্ছিরি! একটু পরেই নিচের সিঁড়িতে পৌঁছাল শব্দটা। থপ্ থপ থপ করে ভারি পা ফেলে উঠে আসছে কেউ। সহসাই হাঁ করে শ্বাস টানল হেনডারসন। কালোমতো কী একটা বেরিয়ে আসছে মেঝে খুঁড়ে!

আসলে ওটা বেসমেন্টের ট্র্যাপডোর। এইমাত্র খুলল। ল্যাম্প হাতে এক লোক বেরিয়ে এসে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ল্যাম্পের আলোয় হলদেটে দেখাচ্ছে মুখ। ঘুম জড়ানো চোখে পাতা পড়ছে ঘন ঘন।

লোকটা মৃদু হেসে নরম কণ্ঠে বলল, দুঃখিত, একটু ঘুমোচ্ছিলাম। তা আপনার জন্যে কী করতে পারি, স্যার?

হ্যালোইনের কসটিউম খুঁজছি আমি।

ও, আচ্ছা। তা কী ধরনের কসটিউম চাই আপনার?

কণ্ঠস্বরটা ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত। হলুদ চেহারায় নিস্তেজ একটা ভাব। চোখ দুটোতে ঘুমের রেশ কাটেনি এখনও।

প্রচলিত সাজের বাইরে একটা ছদ্মবেশ নিতে চাই আমি। মানে উৎসবে গিয়ে সবাইকে একটু ভড়কে দিতে চাই আর কী।

কিছু মুখোশ দেখাতে পারি আপনাকে।

আরে না, নেকড়ে মানব সাজার কোনো শখ নেই আমার। আমি চাই এমন একটা পোশাক, যা দেখে লোকে ছদ্মবেশটাকেই আসল রূপ মনে করে ভয় পাবে।

তা হলে সত্যিকারের পোশাক চাইছেন আপনি!

হ্যাঁ। হেনডারসনের মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। সত্যিকারের পোশাক বলতে কী বোঝাতে চাইছে মাথামোটা লোকটা?

সেরকম একটা পোশাক বোধহয় দিতে পারব, স্যার। চোখ পিট পিট করে বলল সে। তার ঠোঁট জোড়ার ভঁজে হাসির রেখা। জিনিসটা শুধু হ্যালোইনের জন্যেই।

কী রকম?

রক্তচোষা পিশাচের কথা ভেবেছেন কখনও?

ড্রাকুলার মতো?

জ্বী, জ্বী ড্রাকুলা।

আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু আমাকে ওই পোশাকে মানাবে তো?

আঁটো হাসি ফুটল লোকটার মুখে। হেনডারসনের আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, খুব মানাবে।

বেঢপ প্রশংসা! বিদ্রুপের ভঙ্গিতে হাসল হেনডারসন। তা কোথায় সেই সাজ-পোশাক?

সাজ-পোশাক? এটা তো শুধুই একটা পোশাক। তাও রাতের।

রাতের?

জ্বী, এজন্যেই তো দিচ্ছি।

কী সেটা?

একটা আলখাল্লা। একেবারে আসল!

একটা আলখাল্লা-ব্যস, এই?

জী, সার। শুধুই একটা আলখাল্লা। কিন্তু ওটা পরলে মনে হবে শবের কাফন। দাঁড়ান, নিয়ে আসছি।

নড়বড়ে পা দুটো টেনে টেনে আবার দোকানের পেছনে চলে গেল লোকটা। ট্র্যাপোর খুলে নেমে গেল নিচে। হেনডারসন দাঁড়িয়ে রইল

অপেক্ষায়। নিচে আগের চেয়ে আরও বেশি খুটখাট দুমদাম হচ্ছে।

শিগগিরই ফিরে এল বুড়ো। হাতে একটি আলখাল্লা। অন্ধকারে ঝাঁকুনি দিয়ে আলখাল্লা থেকে ধুলো ঝাড়ল সে। তারপর বলল, এই নিন-আসল জিনিস।

আসল?

গায়ে দিলেই টের পাবেন। আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে এটার, বিশ্বাস করুন!

ঠান্ডা, ভারী কাপড়টা কাঁধে চাপাল হেনডারসনের। পেছনে এসে আয়নায় নিজেকে দেখার সময় ছত্রাকের পুরোনো একটা অস্বস্তিকর গন্ধ পেল সে। আলখাল্লা থেকে

আসছে। মৃদু আলো, তবু নিজের চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন নজর এড়াল না হেনডারসনের। তার লম্বাটে মুখটা আরও সরু দেখাচ্ছে, ফ্যাকাসে চেহারার মাঝে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। সমস্তই এই কালো পোশাকের জাদু। একটা বড়সড় কালো কাফন এটা।

নিখুঁত ছদ্মবেশ! বিড়বিড় করে বলল বুড়ো। আয়নায় কোন প্রতিবিম্ব পড়েনি বুড়োর। নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকায় ব্যাপারটা টের পেল না হেনডারসন।

এটা নেব আমি, বলল হেনডারসন। বলো, কত দেব?

আমি নিশ্চিত, এই পোশাকে উৎসবে গেলে দারুণ মজা পাবেন।

আরে, দেব কত তাই বললো।

তা ডলার পাঁচেক দিলেই চলবে।

এই নাও।

ডলার পাঁচটা নিয়ে আলখাল্লাটা হেনডারসনের গা থেকে খুলে নিল বুড়ো। পোশাকটা কাঁধ থেকে নেমে যেতেই আবার স্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভব করল হেনডারসন। দীর্ঘদিন

বেসমেন্টের শীতল গহ্বরে ছিল বলেই হয়তো কাপড়টা অমন বরফের মতো ঠান্ডা-ভাবল সে।

পোশাকটা ভাঁজ করে সহাস্যে হেনডারসনকে বুঝিয়ে দিল বুড়ো।

কালকেই এটা ফিরিয়ে দেব, প্রতিশ্রুতি দিল হেনডারসন।

দরকার নেই। এখন থেকে ওটা আপনার।

মানে?

খুব শিগগিরই ব্যবসা গোটাচ্ছি আমি। কাজেই পোশাকটা রেখে দিলে আমার চেয়ে আপনিই বেশি কাজে লাগাতে পারবেন।

কিন্তু–

কোন কিন্তু নয়, হেনডারসনকে থামিয়ে দিল বুড়ো। বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে বলল, সন্ধেটা আপনার জন্যে আনন্দময় হয়ে উঠুক।

মনে একরাশ জড়তা নিয়ে রওনা হলো হেনডারসন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে বুড়োকে বিদায় জানাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। বুড়োর চোখের পাতা ধীর লয়ে খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। কাউন্টারের ওপাশ থেকে আরেক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হেনডারসনের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সে দৃষ্টির আঁচ অনুভব করল না হেনডারসন। সে বুড়োকে শুভরাত্রি জানিয়ে দরজাটা ঝট করে ভিজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল। যেতে যেতে অবাক হয়ে ভাবল, এ কোন্ পাগলামো করতে যাচ্ছে সে!

.

রাত আটটায় হেনডারসন টেলিফোনে লিন্ডস্ট্রোমকে জানাল, পৌঁছুতে একটু দেরি হবে তার। আলখাল্লাটা গায়ে চাপাতেই আবার সেই ঠান্ডা ভাবটা চলে এল। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার জন্য আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে এল বার বার। আবছা একটা কায়া ছাড়া কিছু দেখতে পেল না আয়নায়। অল্প একটু ড্রিংক করার পর খানিকটা চাঙা বোধ করল হেনডারসন। গরম হয়ে উঠল গা। ড্রিংকস ছাড়া আর কিছু মুখে দিল না সে। ফ্লোর জুড়ে রক্তচোষা পিশাচের মহড়া দিয়ে বেড়াল কিছুক্ষণ। বাদুড়ে রূপান্তরিত হওয়ার ভঙ্গিতে বার বার আলখাল্লার নিচের দিকটা ঝটকা মেরে কাঁধে তুলল ভ্রুকুটিপূর্ণ ভয়াল মূর্তিতে। এই ভয়ঙ্কর খেলায় প্রচুর আনন্দ পেল হেনডারসন। সত্যিই তা হলে একটা পিশাচ হতে যাচ্ছে সে!

কিছুক্ষণ পর লবিতে গিয়ে একটা ক্যাব ডাকল হেনডারসন। এগিয়ে এল ক্যাব। আলখাল্লা গুটিয়ে অপেক্ষা করছিল হেনডারসন, ক্যাবের চালক সেটা দেখামাত্র কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ভাড়া যাবে? নিচু কণ্ঠে শুধাল হেনডারসন।

কো-কো কোথায়? ভয়ে গলা থেকে বেসুরো স্বর বেরোল তার।

প্রচণ্ড হাসি পেল হেনডারসনের। কিন্তু হাসল না। বহু কষ্টে চেপে রেখে ভুরু কুঁচকে তীর্যক কটাক্ষ হানল লোকটার দিকে। আলখাল্লার নিচের প্রান্ত ঝটকা মেরে পেছনে তুলল।

যা-যা-যা-যাব! আসুন!

যেন পালাতে পারলে বাঁচে ড্রাইভার। হেনডারসন বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে গেল।

কোথায় যাব, ব-বস্-মানে, সা-স্যার? তোতলাতে তোতলাতে জানতে চাইল সে।

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব ফ্যাসফ্যাসে বানিয়ে ঠিকানাটা বলল হেনডারসন। তারপর গাড়ির পেছনে গিয়ে বসল। ভীত ড্রাইভার ভুলেও আর তার দিকে তাকাল না।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল ক্যাব। ড্রাইভারের ভয়চকিত ভাব দেখে হাসি আর চেপে রাখতে পারল না হেনডারসন। তার অট্টহাসি শুনে আরও ঘাবড়ে গেল ড্রাইভার। সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ গতিতে গাড়ি ছোটাল সে। তার কান্ড দেখে হেনডারসনের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার যোগাড়। আর ওদিকে ড্রাইভার বেচারা রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছে। হেনডারসনকে জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে হাঁফ ছাড়ল সে। ভাড়া না নিয়েই কেটে পড়ল দ্রুত।

যাক, খাসা হয়েছে ছদ্মবেশটা! মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করল হেনডারসন। উৎসবে বেশ সাড়া জাগানো যাবে। ফুরফুরে মেজাজে এলিভেটরে গিয়ে উঠল সে। এগিয়ে চলল লিন্ডস্ট্রোমের ঢালু ছাদের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

এলিভেটরে হেনডারসন একা নয়, আরও তিন-চারজন আছে। লিন্ডস্ট্রোমের অ্যাপার্টমেন্টে এর আগেও এদের দেখেছে সে। কিন্তু একজনও তাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। উৎসাহ বেড়ে গেল হেনডারসনের। তার মেকি মুখভঙ্গি এবং অদ্ভুত আলখাল্লাটা আমূল বদলে দিয়েছে তাকে। আর এদের দেখো। দামি জবরজং পোশাকে একেকজনের ছদ্মবেশের কী বাহার! স্প্যানিশ ব্যালেরিনা সেজেছে এক মহিলা, এক লোক পরেছে বুল-ফাইটারের পোশাক, অন্য দুজন পুরুষ-মহিলারও ভিন্ন রকম সাজ। তা যে বেশই ধরুক তারা, আসল চেহারা ঢাকতে পারেনি কেউ। হেনডারসন ভালো করেই জানে, ছদ্মবেশটা আসলে তাদের কাছে তেমন কিছু নয়। উৎসবে হাজির হওয়াটাই

বড়ো। বেশিরভাগ মানুষই কসটিউম-পার্টিতে আসে তাদের অবরুদ্ধ ক্ষুধার্ত বাসনাগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে। মেয়েরা আসে তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখাতে, পুরুষেরা দেখাতে চায় পৌরুষ-বুল-ফাইটার। কিংবা সার্কাসের ভাঁড়েরা যেমন দেখায়। এসব একদম বিচ্ছিরি লাগে হেনডারসনের। বাপুরা, বীরগিরি দেখাবে ভালো কথা। তা ঘরের ভেতর কেন? সাহস থাকে তো রাস্তায় নামো। তখন অত ভয় কীসের?

সবার ওপর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল হেনডারসন। প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে দেখতে সুন্দর। চমৎকার স্বাস্থ্য এবং প্রাণ প্রাচুর্যেরও কমতি নেই। তাদের আছে উপযুক্ত সতেজ গলা এবং ঘাড়। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির পেলব হাত দুটির দিকে তাকাল হেনডারসন। কোন কারণ ছাড়াই একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর সংবিত্তি ফিরতেই দেখে এলিভেটরের আরোহীরা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এককোণে। যেন তার সাজ পোশাক আর অভিব্যক্তি দেখে তারা আতঙ্কিত। তাদের কথাবার্তা বন্ধ।

সবাই কেমন চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু যেন বলতে চায় সে। কিন্তু তার আগেই এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। একে একে বেরিয়ে এল সবাই।

একধরনের অস্বস্তি খচখচ করছে হেনডারসনের মনে। কোথাও ভুল হচ্ছে না তো। প্রথমে ড্রাইভার ভয় পেল, তারপর এরা। পানের মাত্রাটা কি বেশি হয়ে গেছে?

কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না হেনডারসন। মার্কাস লিন্ডস্ট্রোম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির। হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিতে চাইছে সে।

আমরা তা হলে এই করতে এসেছি? হালকা সুরে বিদ্রূপ করল হেনডারসন। আরে, তুমি তো টলছ!

লিন্ডস্ট্রোম যে মদের নেশায় চুর, একবার তাকিয়েই যে কেউ বুঝবে। মোটা মানুষটা অ্যালকোহলে সাঁতার কাটছে।

ড্রিংক নাও, হেনডারসন। আমি আর নেব না। তবে তোমার সাজগোজ দেখে চমকে গেছি ভাই। কোত্থেকে এমন মেকআপ নিলে?

মেক-আপ? আমি তো মুখে কিছুই মাখিনি।

ওহ্, তাই তো। কী বোকা আমি!

লিন্ডস্ট্রোমও ঘাবড়ে গেল নাকি? তার চোখ দুটোও কি শঙ্কায় পরিপূর্ণ? অবাক হয়ে গেল হেনডারসন–এতই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে!

দাঁড়াও, ওদিকে একটু ঘুরে আসি, খানিক ইতস্তত করে দ্রুত সটকে পড়ল লিন্ডস্ট্রোম। ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে। তার ঘাড়ের পেছনটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল হেনডারসন। কী পুরু আর সাদা! চামড়ার ভাঁজ ঝুলে পড়েছে কলারের ওপর দিয়ে। একটা নীল শিরা ফুটে আছে ভীত লিন্ডস্ট্রোমের ঘাড়ে।

হেনডারসন বাইরের ঘরে একা দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে গান-বাজনা আর হাসির শব্দ আসছে। বেশ কোলাহলমুখর উৎসব। ভেতরে ঢুকতে একটু দ্বিধা হচ্ছে হেনডারসনের। হাতের গ্লাসটাতে চুমুক দিল সে। বাকর্ডি রাম। কড়া পানীয়। সহজেই নেশা ধরে যায়। চুমুক দিতে দিতে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখল হেনডারসন। সে ভয়াল একটা রূপ ধরতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবাই এভাবে আতঙ্কে সিটিয়ে যাক–এতটা চায়নি। সত্যিই এই পোশাকের বিশেষ কোনো ক্ষমতা আছে? পিশাচের আসল রূপ ফুটে উঠেছে তার মাঝে? লিন্ডস্ট্রোম পর্যন্ত চমকে উঠে মেক-আপের কথা বলেছে। আচ্ছা, চেহারাটাই আগে দেখা যাক।

হলঘরের লম্বা প্যানেল মিররের দিকে এগোল হেনডারসন। একটু উঁকিঝুঁকি মেরে সোজা হয়ে দাঁড়াল চৌকো আয়নার সামনে। পেছন থেকে আসা উজ্জ্বল আলোয় আয়নার কাঁচের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল সে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

আয়নার সামনে সে জলজ্যান্ত বিদ্যমান, অথচ প্রতিবিম্ব পড়েনি! এটা কী করে সম্ভব?

চোখ দুটো ডলে নিয়ে আবার তাকাল সে। ফল একই। প্রতিবিম্ব নেই।

চাপা গলায় হেসে উঠল হেনডারসন। তার কণ্ঠের গভীর থেকে বেরোল এই খলখলে হাসি। ফাঁকা আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমেই : উঁচুতে চড়ল হাসি। হাসিতে কুটিল আনন্দ।

ভালো নেশা ধরেছে, অস্ফুটে বলল হেনডারসন। একটু আগে তবু ঝাপসা প্রতিবিম্ব দেখেছি, আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছি না। নেশার জন্যই চেহারাটা ভীষণ হয়েছে। ভয় পাচ্ছে সবাই।

প্লিজ, একটু সরে দাঁড়াবেন!

একটা সুরেলা কণ্ঠে চমক ভাঙে হেনডারসনের। ঝট করে পেছনে ফেরে সে। তার মতোই কালো পোশাক মেয়েটির। ফর্সা গর্বিত মুখ। মাথায় ঝিকমিকি করছে রেশমের মতো চুলগুলো। নীল চোখে অপার্থিব দ্যুতি। ঠোঁট জোড়া টুকটুকে লাল। স্বর্গের দেবী সেজেছে মেয়েটি।

হেনডারসন নরম কণ্ঠে শুধল, কে আপনি?

শীলা ডারলিং। দয়া করে সরে দাঁড়ালে নাকে একটু পাউডার ঘষতাম।

স্টিফেন হেনডারসন অবশ্যই সরে দাঁড়াবে, হাসল সে। পিছিয়ে এসে জায়গা ছেড়ে দিল মেয়েটিকে।

হেনডারসনকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি মুখ টিপে হেসে বলল, এর আগে কাউকে পাউডার নিতে দেখেননি?

দেখেছি, তবে প্রসাধনীর প্রতি স্বর্গ-সুন্দরীদের এরকম আসক্তির কথা জানতাম না। অবশ্যি স্বর্গের দেবীদের সম্পর্কে খুব কমই জানি। এখন থেকে বিশেষভাবে জানতে চেষ্টা করব তাদের। এই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। হয়তো উৎসবের পুরোটা সময়ই আপনার পেছনে নোটবুক হাতে দেখতে পাবেন আমাকে।

ভ্যাম্পায়ারের হাতে নোটবুক!

হ্যাঁ, আমি খুব বুদ্ধিমান ভ্যাম্পায়ার সেকেলে ট্রানসিলভেনিয়ানদের মতো নই। এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমার সঙ্গ ভালো লাগবে আপনার।

হু আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু স্বর্গের দেবীর সাথে রক্তচোষা-জুটিটা কেমন বেমানান হয়ে যাচ্ছে না!

সে আমরা মানিয়ে নেব, ভরসা দিল হেনডারসন। তা ছাড়া আপনার মাঝেও তো অশুভ ছায়া রয়েছে। ধরুন এই কালো আলখাল্লাটা। এটার জন্যই আপনাকে মনে হচ্ছে ডার্ক-অ্যানজেল। যেন স্বর্গের বদলে আমার জায়গা থেকে এসেছেন।

রসালাপে মজে গেলেও হেনডারসনের মাথায় ঝড়ো বেগে অন্য চিন্তা চলছে। অতীতের সেই বিতর্কের দিনগুলোকে স্মরণ করছে সে। গ্রিসের প্রাচীন দর্শনে কী প্রচণ্ড বিশ্বাসই না ছিল তার!

একসময় হেনডারসন বন্ধুমহলে ঘোষণা দিয়েছিল, শুধু নাটক-নভেল ছাড়া বাস্তবে প্রথম দর্শনে প্রেম বলে কিছু নেই। সে বলে বেড়াত, নাটক নভেল থেকে মানুষ প্রেম সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেই অনুসারে সবার মনে প্রথম দর্শনে প্রেম নিয়ে একটা বিশ্বাস জন্মে, যখন সম্ভবত কামনাকে অনুভব করা যায়।

এবং এ মুহূর্তে শীলা–এই স্বর্ণকেশী সুন্দরী তার মন থেকে সব অসুস্থ চিন্তা, মদের নেশা, আয়নার ভেতরে বোকার মতো উঁকিঝুঁকি একই সঙ্গে ঝেটিয়ে বিদেয় করেছে। তার চোখে এখন রঙিন স্বপ্ন। এক জোড়া লাল ঠোঁট, দ্যুতিময় নীল চোখ এবং পেলব দুটি বাহু উতলা করে তুলেছে তাকে।

হেনডারসনের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের খবর পেয়ে গেল মেয়েটা। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে, এখন থেকে আমরা দুজন একে অন্যের কাছে আর আপনি নই। তুমি!

এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! তবে আমি চাই আরেকটু কাছে যেতে। স্বর্গের দেবী কি নাচবে আমার সাথে?

চতুর ভ্যাম্পায়ার! চলো, ও ঘরে যাই।

হাতে হাত রেখে পার্লারে ঢুকল ওরা। হাসি-আনন্দে ভরপুর উৎসব। ঘর জুড়ে নেশার তরলের ছড়াছড়ি। তবে নাচের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না কারও। জোড়া জোড়া নারী-পুরুষ ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে খোশগল্পে মশগুল। উৎসবের রীতি অনুযায়ী ছদ্মবেশধারীরা ঘরের কোণে নানান রঙঢঙে মত্ত। হেনডারসন ঘরে ঢোকা মাত্রই ভারী হয়ে উঠল আনন্দমুখর পরিবেশ।

হেনডারসন যখন ভরা আসরের মাঝখানে গিয়ে আলখাল্লার প্রান্ত ঝটকা মেরে কাঁধে তুলল, অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সবার মাঝে। ধ্যান গম্ভীর নীরবতা নেমে এল ঘরে। বড়ো বড়ো পা ফেলে এগোতে এগোতে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল হেনডারসনের কুটিপূর্ণ চেহারা। শীলাকে দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে বিরাট একটা তামাশা হিসেবে নিয়েছে সে।

ওদের দেখিয়ে দাও, ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে! ফিক্ করে হাসল শীলা। শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল হেনডারসনের বাহু। উৎসাহে প্রভাবিত হলো হেনডারসন। যুগলদের দিকে শ্যেনদৃষ্টি হানতে হানতে এগিয়ে গেল সে। বিশেষ করে মেয়েদের বিকট মুখভঙ্গি করে ভয় দেখাল। অতিথিদের ঝটিতি ঘাড় ফেরানো, তাৎক্ষণিক মৃদু আর্তনাদ-এসব বুঝিয়ে দিল হেনডারসনের উদ্দেশ্য কতটা সফল। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো লম্বা ঘর জুড়ে বিচরণ করছে সে। পেছন থেকে ক্রমাগত ফিসফাস্ আসছে তার কানে।

লোকটা কে?

আমাদের সাথেই এলিভেটরে এসেছে, এবং সে...

তার চোখ দুটো দেখেছ...

সাক্ষাৎ রক্তচোষা!

হ্যালো, ড্রাকুলা! মার্কাস লিন্ডস্ট্রোম এবং ক্লিওপেট্রার বেশধারী এক গোমড়া মুখো শ্যামলা মেয়ে এগিয়ে এল হেনডারসনের দিকে। দুজনেই বেসামাল। ক্লাবে যখন লিন্ডস্ট্রোম স্বাভাবিক থাকে, লোকটাকে তখন ভালোই লাগে হেনডারসনের। কিন্তু পার্টি বা উৎসবে

লোকটাকে সহ্য করা মুশকিল। যেমন-এ মুহূর্তে তাকে আর যাই হোক ভদ্র বলা যাবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ, ঘোষণা দেয়ার ভঙ্গিতে চেঁচাল লিন্ডস্ট্রোম। এই হ্যালোইনের রাতে আমার অত্যন্ত প্রিয় এক বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সাথে। কাউন্ট ড্রাকুলা এবং তার মেয়েকে দাওয়াত করেছিলাম। তারাই এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত। কাউন্টের দাদিকেও আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি জেমিমা ফুপুকে নিয়ে আরেকটা পার্টিতে গেছেন। আসুন, কাউন্ট, আমার ছোট্ট খেলার সাথিটির সাথে কথা বলুন।

ওহ, ড্রাকুলা! অবাক হওয়ার ভান করল মেয়েটি। কী বড়ো বড়ো চোখ আপনার! কত বড়ো বড়ো দাঁত! ও-ওহ-

অন্য কোনো সময় হলে লিন্ডস্ট্রোমের চোয়ালে ধাই করে একটা ঘুসি মেরে বসত হেনডারসন। কিন্তু এই হাসিখুশি পরিবেশে এতগুলো লোকের সামনে এমন কাজ করাটা মোটেও সমীচিন হবে না। তা ছাড়া শীলা আছে পাশে। এরচে উজবুক লোকটার স্থূল রসিকতায় তাল দেয়াই ভালো। হ্যাঁ, সে পিশাচই একটা!

মেয়েটার দিকে ফিরে মুচকি হাসল হেনডারসন। তারপর ঋজুভঙ্গিতে সমবেত অতিথিবৃন্দের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল সে। হাত দুটো ঘষল আলখাল্লায়। আশ্চর্য, কাপড়টা এখনও ঠান্ডা! নিচের দিকে তাকাতেই প্রথমবারের মতো তার নজর পড়ল,

আলখাল্লার শেষ প্রান্তে ময়লা লেগে আছে। জমাট ধুলো কিংবা কাদা। ভালো করে দেখার জন্যে আলখাল্লার নিচের দিকটা লম্বা একটা হাত দিয়ে টেনে তুলল সে। কিন্তু বুক পর্যন্ত তোলার পর পিছল ঠান্ডা সিল্ক হাত ফস্কে পড়ে গেল। বেশ অনুপ্রাণিত দেখাল তাকে। তার চোখ দুটো আরেকটু বড়ো এবং জুলজুলে হলো।

ফাঁক হয়ে গেল মুখ। অদ্ভুত একটা ইন্দ্রিয়শক্তি ভর করল তার ওপর। মার্কাস লিন্ডস্ট্রোমের নরম, মোটা গলার দিকে তাকাল সে। সাদা চামড়ায় নীল শিরা ফুটে আছে। ঘরভর্তি লোক তাকিয়ে আছে তার দিকে। অনুভূতিটা এবার পুরোপুরি গ্রাস করল তাকে। ভাঁজ ভাঁজ চামড়ার গলার ওপর চোখ দুটো স্থির হলো। একজন মোটা মানুষের তুলতুলে গলা!

হেনডারসনের হাত দুটো বেরিয়ে এসেছে। লিন্ডস্ট্রোম ভীত ইঁদুরের মতো চি চি করে উঠল। তেল চর্চকে নাদুসনুদুস ইঁদুরের মতো লাগছে লোকটাকে। রক্তে ঠাসা শরীর। পিশাচেরা রক্ত পছন্দ করে। কিচমিচ করা ধাড়ি ইঁদুরের গলার শিরা থেকে বের হওয়া রক্ত!

উষ্ণ রক্ত! মনের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিল হেনডারসন। কণ্ঠের গভীর থেকে বেরোল কথাটা।

হাত দুটো ইতোমধ্যে লিন্ডস্ট্রোমের গলায় গিয়ে পৌচেছে। কী উষ্ণ গলা! পাগলের মতো শিরা খুঁজে বের করল সে। মুখটা এগিয়ে যাচ্ছে গলার দিকে। নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল লিন্ডস্ট্রোম। কিন্তু হেনডারসনের বজ্রমুঠি আরও চেপে বসল গলায়। লালচে হয়ে গেল লিন্ডস্ট্রোমের চেহারা। রক্ত সব উঠে আসছে মাথায়। এইতো চাই। রক্ত!

মুখটা আরও বড়ো হলো হেনডারসনের। শিরশির করে উঠল দাঁত। মোটা গলাটা স্পর্শ করল মুখ। তারপর–

থামো! যথেষ্ট হয়েছে! শীতল কণ্ঠ শীলার। হেনডারসনের হাত ধরে টানছে সে। মাথা তুলে তাকাল হেনডারসন। নিজের কান্ড দেখে নিজেই হতবাক। লিন্ডস্ট্রোমকে ছেড়ে দিল সে। হাঁ করে হাঁপাচ্ছে বেচারা। বিস্ময়ে গোল হয়ে গেছে দর্শকদের মুখ।

হেনডারসনের কানের কাছে ফিসফিস করল শীলা, এটা কী করলে! ভয়ে তো বেচারা আধমরা!

নিজের মাঝে ফিরে আসার চেষ্টা করল হেনডারসন। সবার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে হাসল। বলল, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের উৎসবের আয়োজক আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার ছোট্ট একটা প্রমাণ দেখালাম আপনাদের। আমি সত্যিই একটা রক্তচোষা। তবে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, দ্বিতীয়বার আর এমন দৃশ্য দেখতে হবে না। এখানে যদি কোনো ডাক্তার থাকেন, তা হলে অবশ্যি রক্ত বদলের একটা আয়োজন করতে পারি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই। গোল মুখগুলোতে হাসির হুল্লোড় উঠল। বেশিরভাগই হাসল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো। হেনডারসন তৃপ্ত। কিন্তু মার্কাস লিন্ডস্ট্রোমের মুখে হাসি নেই। সে ভয়-বিহ্বল চোখে হেনডারসনের দিকে তাকিয়ে। হেনডারসন ভালো করেই জানে, তার ভয়টা কীসের।

জটলা ভেঙে যে যার মতো ছড়িয়ে পড়ল আবার। এলিভেটর থেকে এক তাড়া খবরের কাগজ নিয়ে বেরিয়ে এল একজন। রঙ মেখে চেহারাটা ঢেকে ফেলেছে সে। মাথায় ক্যাপ আর গায়ে অ্যাপ্রোন চাপিয়ে নিউজ-বয় সেজেছে। পত্রিকা হাতে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল সে, গরম খবর! তাজা খবর! পড়ুন সবাই। হ্যালোইনের বড়ো চমক! বাড়তি আকর্ষণ!

কলহাস্যরত অতিথিরা কিনতে লাগল পত্রিকা। এক মহিলা এগিয়ে এল শীলার দিকে। শীলাকে যেতে বলল তার সাথে। বিমূঢ় একটা ভাব নিয়ে তার সাথে এগোল শীলা। হেনডারসনকে শুধু বলল, যাই, আবার দেখা হবে।

শীলার অবজ্ঞা গায়ে জ্বালা ধরাল হেনডারসনের। মেয়েটা মনে মনে খেপে গেছে তার ওপর। কিন্তু সে নিজেই তো বুঝতে পারছে না, লিন্ডস্ট্রোমকে ওভাবে চেপে ধরেছিল কেনো! উহ্, কী ভয়ানক সেই অনুভূতি! কেনো এমন হয়েছিল?

নকল নিউজবয় সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকটা অজান্তেই একটা পত্রিকা কিনে ফেলল হেনডারসন। দেখাই যাক, হ্যালোইনের বড়ো চমকটা কী?

প্রথম পৃষ্ঠায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কোনো চমক আবিষ্কার করতে পারল না হেনডারসন। পাতা উলটে শেষ পৃষ্ঠায় চলে এল সে। পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত শিরোনাম। শুধু চমকই নয়, খবরটা হেনডারসনের জন্য একটা রোমহর্ষক ব্যাপার। পড়তে পড়তে আতঙ্কের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাল সে।

আজ এক কসটিউম-শপে আগুন লাগে...আটটার পরপরই দমকল বাহিনী সেখানে পৌঁছে...আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়...সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত...ক্ষতির পরিমাণ ভীষণ অদ্ভুত, মালিকের পরিচয় জানা যায়নি...কঙ্কালটা পাওয়া গেছে–

না! সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠল হেনডারসন।

খবরটা আরেকবার পড়ল সে। আবার কঙ্কালটা পাওয়া গেছে দোকানের নিচে, সেলারে, একটা মাটির বাক্সে। আর বাক্সটা একটা কফিন। আরও দুটো বাক্স ছিল সেখানে। দুটোই খালি। কঙ্কালটা একটা আলখাল্লায় মোড়ানো ছিল। আগুন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি ওটার।

খবরের শেষে একটা বক্স এঁকে তাতে মোটা কালো কালো অক্ষরের শিরোনামসহ প্রত্যক্ষদর্শীদের মন্তব্য ছাপা হয়েছে। পড়শিরা বড়ো ভয় পেত জায়গাটাকে। তাদের ধারণা হাঙ্গেরির ওদিকে দোকানের মালিকের বাড়ি। অজানা-অচেনা সব লোক আসত দোকানটায় ডাকিনীবিদ্যার চর্চা, প্রেত পূজা–এসব নাকি চলত ওখানে। প্রণয়োদ্দীপক পানীয়, জাদু-টোনার তাবিজ, রহস্যময় ভূতুড়ে পোশাক-কুসংস্কারমূলক বিভিন্ন জিনিসই ছিল দোকানটার পণ্য।

ভূতুড়ে পোশাক-পিশাচ-আলখাল্লা-একে একে সবই ধরা পড়ল হেনডারসনের চোখে। মনে পড়ে গেল বুড়োর সেই কথাগুলো-একটা আলখাল্লা। একেবারে আসল!

তা ছাড়া বুড়ো আলখাল্লাটা ফেরতও নিতে চায়নি। বলেছে–দরকার নেই। এখন থেকে ওটা আপনার।

কথাগুলো ঘাই মারল হেনডারসনের মগজে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। সেই প্যানেল মিররের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্ত মাত্র স্থির রইল সে। তারপরই আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত উঠে গেল চোখের সামনে। প্রতিবিম্ব পড়েনি আয়নায়। সহসাই ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল, ভ্যাম্পায়ারদের কোনো প্রতিফলন ঘটে না।

কোনো সন্দেহ নেই কিছু একটা ভর করেছে তার ওপর। এই অশুভ শক্তি তাকে কোমল হাত আর মাংসল গলার দিকে টানছে। এজন্যেই লিন্ডস্ট্রোমকে জাপটে ধরেছিল সে। হায় ঈশ্বর!

ছাতলা পড়া এই কুচকুচে কালো আলখাল্লাটাই যত নষ্টের গোড়া। কোনো সাধারণ মাটি নয়, কবরখানার মাটি লেগে আছে এটার সাথে। হিমশীতল এই পোশাকটাই তার মাঝে একটা খাঁটি রক্তচোষাকে জাগিয়ে তুলেছে। এখন ভাবতেই কেমন ঝিমঝিম করছে মাথা– একসময় সত্যিকারের এক পিশাচের সম্পত্তি ছিল অভিশপ্ত পোশাকটা! এটার আস্তিনে যে মরচে-রঙা দাগ দেখা যাচ্ছে, নির্ঘাত শুকনো রক্ত।

রক্ত! দেখতে কী সুন্দর এই জিনিস! রক্তের উষ্ণতায় আছে প্রাণ, আছে প্রবহমান জীবন।

দূর, উন্মত্ত মাতালের মতো কী যা তা ভাবছে সে!

ও, আমার ভ্যাম্পায়ার বন্ধুটি তা হলে এখানে! শীলা কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি হেনডারসন। বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয় তার। শীলার উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাতেই সে টের পায়, মেয়েটির টুকটুকে ঠোঁট তাকে নীরব আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। উষ্ণ একটা ঢেউ অনুভব করে হেনডারসন। ঝলমলে কালো পোশাক ভেদ

করে উঁচু হয়ে থাকা শীলার। ধবধবে গলার দিকে তাকায় সে। আরেকটা উষ্ণতা জেগে ওঠে তার মাঝে। এই উষ্ণতায় রয়েছে ভালোবাসা, কামনা এবং একটি ক্ষুধা।

হেনডারসনের চোখের ভাষা বুঝে নেয় শীলা। তার চোখেও যে ওই আগুন। সেও ভালোবেসে ফেলেছে সামনে দাঁড়ানো পুরুষটিকে।

আবেগের তাড়নায় চট করে আলখাল্লাটা খুলে ফেলে হেনডারসন। বরফ শীতল ভার নেমে যায় গা থেকে। সে এখন অভিশপ্ত পোশাকটার নাগপাশ থেকে মুক্ত। শীলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার তীব্র একটা ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু জড়তা এসে বাধা দেয়।

কী, ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? বলল শীলা। একই শিহরণ তাকেও দোলা দিচ্ছে। সেও খুলে ফেলে তার আলখাল্লা-অশুভ আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে সত্যিকারের দেবী। অ্যানজেলের পোশাকে দারুণ লাগছে শীলাকে। সোনালি চুল এবং গর্বিত ভঙ্গিমার মাঝে ফুটে উঠেছে তার পূর্ণাঙ্গ নারীসত্তা। অজান্তেই প্রশংসা-ধ্বনি বেরোয় হেনডারসনের কণ্ঠ থেকে। সে ফিসফিস করে বলে, আমার স্বর্গ-সুন্দরী!

শীলাও সাড়া দেয়, আমার শয়তান!

পরমুহূর্তে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয় দুজন। শীলার আলখাল্লাটা চলে আসে হেনডারসনের হাতে। দুরন্ত আবেগে একাকার হয়ে যায় দুজোড়া ঠোঁট।

লিন্ডস্ট্রোম এবং তার কজন সঙ্গীর আকস্মিক আগমন দুজনের দুর্বার ভালোবাসায় ছেদ ঘটাল। গল্প করতে করতে ঢুকে পড়েছে তারা।

হেনডারসনকে দেখেই কুঁকড়ে গেল লিন্ডস্ট্রোম। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, তু-তুমি এখনও আছ!

ভয় নেই, হাসল হেনডারসন। এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

শীলাকে জড়িয়ে ধরে খালি এলিভেটরের দিকে এগোল হেনডারসন। তরাস খাওয়া লিন্ডস্ট্রোমের ছাই-বরণ মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ হলো। দরজা।

আমরা কি চলে যাচ্ছি? হেনডারসনের কাঁধে মাথা রেখে জানতে চাইল শীলা।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে মাটির ধরায় নয়। নিচে আমার জগতে না গিয়ে যাচ্ছি। ওপরে–তোমার ভুবনে।

ছাদের বাগানে?

হ্যাঁ গো, আমার স্বপ্নের রানি। স্বর্গের বাগানে বসে গল্প করব আমরা। মেঘের চুড়ায় বসে চুমু খাব তোমাকে। তারপর–

শীলার ঠোঁট দুটো কথা শেষ করতে দিল না হেনডারসনকে। এলিভেটর উঠতে লাগল আপন গতিতে।

একসময় বিচ্ছিন্ন হলো দুজন। হেনডারসন বলল, দেবীর সাথে শয়তান। এ কেমন জুটি!

আমিও তাই বলেছি, মনে করিয়ে দিল শীলা। আমাদের সন্তানেরা স্বর্গীয় মহিমা, না শয়তানের শিঙ নিয়ে জন্মাবে?

দুটোই থাকবে ওদের সাথে। দেখে নিয়ে।

খোলা নির্জন ছাদে বেরিয়ে এল দুজন। হেনডারসন আবারও অনুভব করল, আজ হ্যালোইনের রাত। নিচে লিন্ডস্ট্রোম এবং তার সোসাইটি-বন্ধুরা আমোদ-ফুর্তি আর মদ্য পানে মগ্ন। আর এখানে আলো নেই, শব্দ নেই, পানাহার নেই। নিস্তব্ধ বিষণ্ণ একটি রাত। অন্যান্য রাতের মতোই সাধারণ। তবু এ রাতের আলাদা একটা মর্ম আছে।

আকাশটা এ মুহূর্তে নীল নয়, কালো। কমলা চাঁদের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো ধূসর মেঘগুলোকে দৈত্যের থোকা থোকা দাড়ির মতো লাগছে। সাগরের ওদিক থেকে আসা ঠান্ডা বাতাসে মৃদু গুঞ্জন।

শীতও পড়েছে বটে!

আমার কাপড়টা দাও, মৃদু কণ্ঠে বলল শীলা।

পোশাকটা ফিরিয়ে দিল হেনডারসন। পাক খেয়ে ঝলমলে কালো কাপড়টার ভেতর ঢুকে পড়ল শীলা। তার ঠোঁট দুটো আবারও তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। হেনডারসন উপেক্ষা করতে পারল না। জোড়া লেগে গেল দুজোড়া ঠোঁট।

শীতে মৃদু কাঁপছে হেনডারসন। শীলা দেখে বলল, আলাখাটা পরে নাও।

হেনডারসনও আলখাল্লা গায়ে দেয়ার কথা ভাবছে। এটা পরে মেয়েটার দিকে তাকালে কামনা জেগে উঠবে তার। তারপর তৃষ্ণা। প্রথমে সে চুমু খাবে শীলাকে, তারপর ধীরে ধীরে পৌঁছাবে তার মসৃণ গলায়। ভালোবাসায় ভাসতে ভাসতে সানন্দে গলাটা এগিয়ে দেবে শীলা। তারপর

এটা পরো, ডার্লিং কথা শোনো। শীলার অধৈর্য চোখে তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে।

উত্তেজনায় কেঁপে উঠল হেনডারসন। সত্যিই সে আঁধারের প্রতীক আলখাল্লাটা পরবে? কবরের গন্ধ মাখা মৃত্যুর পোশাক গায়ে দিয়ে সাজবে রক্তচোষা?

দেখি, একটু ঘোরো তো।

শীলার শীর্ণ হাত দুটো আলখাল্লাটা কাঁধে চাপাল হেনডারসনের। মেয়েটা গভীর মমতায় হাত বোলাল তার গলায়। তারপর আটকে দিল আলখাল্লার বোতাম।

হেনডারসন টের পেল, বরফ-শীতল সেই পরশটা ক্রমেই ভয়ানক রকম উষ্ণতার দিকে যাচ্ছে। নিজেকে আগের চেয়ে আরও বেশি অনুভব করতে পারছে সে। চেহারার পরিবর্তন স্পষ্ট বুঝতে পারছে। এর নাম শক্তি। একটা অশুভ শক্তি!

সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখে চাপা কৌতুক, প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ। তার হাতির দাঁতের মতো সাদা সরু গলাটার দিকে তাকাল হেনডারসন। একটু পরেই ওখানে পৌঁছাবে তার ঠোঁট। তারপর–

না-এটা হতে পারে না। মেয়েটাকে সে ভালোবাসে। তার ভালোবাসা অবশ্যই এই পাগলামিকে জয় করবে। হ্যাঁ, এই পোশাক পরেই, এটার শক্তিকে হটিয়ে দিয়ে, শীলাকে

বুকে টানবে সে। শয়তানের মতো নয়, একজন মানুষের মতো নিজের প্রেমিকাকে গ্রহণ করবে। এটা তার জন্যে একটা পরীক্ষা।

তোমাকে একটা ঘটনা বলব, শীলা।

চোখ বড়ো বড়ো করে শুনতে উন্মুখ হলো মেয়েটা।

আজ রাতের পত্রিকাটা পড়েছ?

হ্যাঁ।

আমি-আমি ওই দোকান থেকে এই আলখাল্লাটা কিনেছি। অদ্ভুত একটা আসুরিক শক্তি আছে এটার। তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। লিন্ডস্ট্রোমকে কেমন ঠেসে ধরেছিলাম, তুমি তো দেখেছই। ওটা আসলে কিন্তু অভিনয় ছিল না। আমি সত্যিই দাঁত ফুটিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম ওর গলায়। এই পোশাকটা আমার ভেতর সত্যিকারের পিশাচের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি, শীলা।

আমি জানি। চাঁদের আলোতে চিকচিক করছে মেয়েটার চোখ।

আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। এই পোশাকে চুমু খাব তোমাকে। আমি প্রমাণ করতে চাই, ওই জিনিসের চেয়ে আমার ভালোবাসার শক্তি বেশি। যদি দুর্বল হয়ে পড়ি, ব্যর্থ হই, কথা দাও–দ্রুত পালিয়ে যাবে তুমি। আমাকে ভুল বুঝো না, লক্ষ্মীটি! ওই অশুভ শক্তির সাথে প্রাণপণ লড়ব আমি। আমার ভালোবাসা তোমার জন্য নিখাদ এবং নিরাপদ হোক-এটাই তো আমি চাই। কী, ভয় পেলে?

না। শীলা এখনও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সে যেমন তাকিয়ে আছে মেয়েটার গলার দিকে। বেচারি যদি তার মনের খবর জানত!

তুমি আবার ভেবে বসোনা, মাথাটা আমার বিগড়ে গেছে, বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল হেনডারসন। ওই দোকানে-এক বিরক্তিকর বেঁটে বুড়ো এই আলখাল্লাটা আমাকে দিয়ে বলল, এটা নাকি সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ারের পোশাক। ভেবেছিলাম বুড়ো তামাশা করেছে। কিন্তু এই পোশাকে আয়নার। সামনে দাঁড়ালে কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না এবং এটার প্রভাবেই লিন্ডস্ট্রোমের গলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এমনকী তোমার প্রতিও। কাজেই আমাকে পরীক্ষাটা করতেই হবে।

শীলা তৈরি। চেহারায় চাপা কৌতুক। হেনডারসন তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বিপরীত দুই অনুভূতির। কমলা চাঁদের ভৌতিক আলোতে মুহূর্তকাল মাত্র স্থির দেখা গেল তাকে। পরক্ষণে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল কঠোর চেষ্টার চিহ্ন।

মেয়েটা তাকে প্রলুব্ধ করল। তার লাল টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিল সাদা দাঁত। কালো আলখাল্লার ভেতর থেকে ফর্সা দুটি হাত এসে আস্তে করে পেঁচিয়ে ধরল হেনডারসনের গলা। মেয়েটা এবার মুখ টিপে হেসে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠল, আমি আগে থেকেই জানি, আমারটার মতো তোমার আলখাল্লাটাও আসল। তুমি যেখান থেকে এনেছ, আমারটাও একই জায়গার। আয়নায় শুধু তোমার না, আমারও কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না। বোকা, খেয়াল করোনি।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে বরফের মতো জমে গেল হেনডারসন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজোড়া চতুর ঠোঁট তার গলা স্পর্শ করল। কুট করে বিধে গেল সুতীক্ষ দাঁত। প্রথমে সূক্ষ্ম একটা বেদনা, তারপর আশ্চর্য সুখকর অনুভূতি। একটা সর্বগ্রাসী অন্ধকার ক্রমশ গিলে খেতে লাগল হেনডারসনকে।

# লালমৃত্যু

সেই সময় গোটা দেশজুড়ে রক্তাক্ত মৃত্যুর প্রতিধ্বনি। দেশটা যেন ধ্বংসের মুখের খাবারের মতো গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে। এই রক্তাক্ত মৃত্যুটাও একধরনের ব্যাধি, যে ব্যাধির আক্রমণে সমস্ত জায়গাজুড়ে রক্তবন্যা বয়ে চলে।

এই রোগের লক্ষণ হলো প্রথমে তীব্র একটা যন্ত্রণার অনুভূতি, তারপর মাথা ঘোরা, সবশেষে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে অবিরত রক্ত ঝরা। সারা শরীরটাই রক্তের দাগে ভরে ওঠে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো এই রোগের শিকার যাতে বাইরের কোনো সাহায্য কিংবা তার পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে কোনোরকম সহানুভূতি পেতে না পারে তার জন্য শিকারের মুখটা আঠালো ফিতে দিয়ে আঁটা থাকে। এই শিকার ধরা থেকে তাকে শেষ করতে সময় লাগে মাত্র আধঘণ্টা। এই আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ঘটনাটা নিখুঁতভাবে ঘটে যায়।

এ রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের ফলে রাজকুমার প্রসপেরোর রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। রাজকুমার প্রসপেরো খুব সুখী আর ভীষণ আমুদে স্বভাবের ছিলেন। তাঁর ছিল খুব সাহস আর ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। যখন দেখলেন তার রাজ্যের লোকসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে তখন তিনি তাঁর দরবারের হাজারখানেক যোদ্ধা আর অভিজাত মহিলাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তারপর নিজের তৈরি করা নির্জন দুর্গগুলোর একটাতে ওদেরকে পাঠিয়ে দিলেন।

ওদের যে দুর্গটায় পাঠানো হলো সেটা অদ্ভুত ধরনের দেখতে। এ থেকে রাজকুমারের নিজস্ব অভিজাত আর অদ্ভুত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গার চারদিক জুড়ে উঁচু আর শক্ত দেওয়াল। আর দেওয়ালটার চারদিকেই মাঝে মাঝে লোহার গেট। মানুষগুলোকে লোহার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর দরজার বগুলো গরম করে হাতুড়ি পিটে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এর ফলে দুর্গের মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটলে কারো পক্ষেই বাইরে আসার উপায় ছিল না। আবার তেমনি কেউ ইচ্ছা করলেই ভিতরে ঢুকতে পারত না।

তবে দুর্গের ভিতরে সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে যা যা প্রয়োজন সবকিছুরই সুব্যবস্থা ছিল। আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা এই দুর্গের ভিতরে করা হয়েছিল। আনন্দ দেওয়ার জন্য একদল সুন্দরী রমণী ছিল আর খাওয়ার জন্য ঢালাও মদের ব্যবস্থা ছিল। দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থাটাও ছিল খুব নিখুঁত, কোনো ভয় ছিল না। শুধু দুর্গে একটাই জিনিস ছিল না তা হচ্ছে–রক্তাক্ত মৃত্যু।

রক্তাক্ত মৃত্যুর কথা বলার আগে দুর্গটার বর্ণনা দিয়ে নিই। এই দুর্গটা ছিল সাতটা ঘর বিশিষ্ট একটা রাজকীয় অট্টালিকা। এই বিরাট ঘরগুলোর সবটা একনজরে দেখা যায় না। কারণ ঘরগুলোর দরজাগুলো অদ্ভুত ধরনের। আসলে এইরকম অসম্পূর্ণ দেখানোটাই ছিল ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য। কুড়ি কিংবা তিরিশ গজ অন্তর একটা করে বাঁক আর বাঁকগুলো দেখলে কেমন রহস্যময় মনে হতো। দেওয়ালের ডান-বা দুদিকেই ঠিক

মাঝখানে একটা করে লম্বাটে ধরনের ভূতুড়ে জানালা। ঘরের বাইরে টানাবারান্দা। প্রতিটি ঘরেই হু হু বাতাস বইত। প্রত্যেকটা জানালায় কাঁচ লাগানো ছিল। কিন্তু জানালার কাঁচের রং অদ্ভুত ধরনের। প্রত্যেক ঘরের প্রতিটি সরঞ্জাম যে রঙের ছিল সেই ঘরের জানালার কাঁচের রঙটা ওই ঘরের সাজ-সরঞ্জামের রঙের মতো ছিল। যেমন পূর্বদিকের প্রথম ঘরের প্রতিটি সাজসরঞ্জাম নীল রঙের, তাই ঐ ঘরের জানালার কাঁচের রঙটাও নীল রঙের ছিল। দ্বিতীয় ঘরটায় বেগুনী রঙের জিনিসপত্র সাজানো ছিল, তাই ঘরের জানালার কাঁচও বেগুনী রঙের ছিল। এইভাবে তৃতীয় ঘরের জানালার কাঁচের রঙ সবুজ! চার নম্বর ঘরের জানালার কাঁচের রঙ কমলা। পাঁচ নম্বর ঘরের জানালার কাঁচের রঙ সাদা। ছয় নম্বর ঘরটার জানালার কাঁচের রঙ ছিল ধূসর। আর পশ্চিমদিকের সাত নম্বর ঘরটার প্রতিটি সাজ-সরঞ্জাম ছিল কালো রঙের। এই ঘরের কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত সবকিছুই কালো রঙের ছিল। এমনকি ঝুলে থাকা পর্দাগুলো আর মেঝেয় বিছানো কার্পেটটাও কালো রঙের ছিল। কিন্তু এই সাত নম্বর ঘরের জানালার কাঁচের রঙটা ছিল আলাদা। কালো না হয়ে লাল রঙ ছিল। এই লাল রঙটা দেখলেই মনে হতো–তাজা ঘন রক্তের মতো।

দুর্গের সাতটা ঘরের মধ্যে কোনোটাতেই কিন্তু আলোর ব্যবস্থা নেই। এমনকি কড়িকাঠে ঝোলানো ঝাড়বাতি কিংবা প্রদীপ কোনোকিছুরই ব্যবস্থা ছিল না। শুধু মাঝখানে কিছু সোনার অলংকার ছাদ বেয়ে নেমে এসে এদিক-ওদিক ঝুলছে। ফলে সবগুলো ঘর ছিল আলোবিহীন। শুধু ঘরের বাইরে লম্বা বারান্দায় প্রতিটি জানালার ঠিক উলটোদিকের বারান্দাতে একটা করে তিনপায়া টুল রাখা আর এই টুলের উপর থাকত জ্বলন্ত অঙ্গারের

পাত্র। এই জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে যে আলো বের হতো তা রঙিন জানালাগুলোর কাঁচ ভেদ করে ঘরের মধ্যে যখন পড়ত তখন প্রতিটি ঘরই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠত। যেন একটা ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হতো। এই সাতটা ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হতো পশ্চিমদিকের সাত নম্বর ঘরটায়। অঙ্গারের আলো যখন ওই লাল ঘরের রক্তের কাঁচের জানালা ভেদ করে ঘরের মধ্যে দিয়ে কালো পর্দাগুলোর ও মেঝের কার্পেটের উপর পড়ত তখন ভয়ানক গা-ছম্ছ- করা একটা ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি হতো। এই পরিবেশে যদি কেউ এই ঘরে ঢুকতো তখন তার মুখটায় একটা নিষ্ঠুর, ভয়ংকর ভাব ফুটে উঠত, যার জন্যে এই ঘরটাকে দুর্গের সবাই এড়িয়ে চলত। খুব কম লোকই এই সাত নম্বর ঘরটায় ঢুকতে সাহস পেতো।

সাত নম্বর ঘরটার পশ্চিমদিকের দেওয়ালে আরও একটা অদ্ভুত জিনিস রাখা ছিল। তা হচ্ছে আবলুস কাঠের মস্তবড় ঘড়ি। এই ঘড়ির পেণ্ডুলামটা ছিল বিশ্রী, কেমন যেন একঘেয়ে বিশ্রীভাবে শব্দ করে দুলতে থাকত, মিনিটের কাঁটাটা ঘুর পাক খেয়ে যখন একটা ঘণ্টা পুরো হতো তখনই ঘড়িটার পেতলের হৃৎপিন্ড ফুড়ে একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ বেরিয়ে আসত। শব্দটা ছিল পরিষ্কার, জোরালো ও গম্ভীর। এই শব্দের মধ্যে একটা জাদু আছে, যখনই শব্দটা হতো তখন যারা বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজাত তারা বাজনা থামিয়ে চুপটি করে শব্দ শুনত। নাচ, গান তখন সব থেমে যেত, সমস্ত কিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে যেত। সবাই যেন এই শব্দ থেকে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করত আর সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত।

শব্দটা যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত তখন আবার সবাই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠত। একে অন্যের দিকে তাকাত, হাসত, গল্প করত। ওদের এই হাসি, কানো দেখলেই মনে হতো সবটাই ওদের ভয়ের জন্যে। তারপর ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত, বলত আবার যখন এই শব্দটা হবে তখন ওরা এমনি করে বোকার মতো চুপ করে থাকবে না, কিন্তু ওদের বালাই সার হতো। সেই ষাট মিনিট অর্থাৎ তিন হাজার ছশো সেকেন্ড পরে ঘড়িটা আবার এই অদ্ভুত সুরে বেজে উঠত, তখন ওদের আগের কথা মনে থাকত না। আগের মতো সবকিছু থেমে যেত, মানুষগুলো সব বোকার মতো নিশ্চুপ হয়ে যেত, ওরা সবাই কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করত। প্রতি ঘণ্টায় এইরকম অদ্ভুত শব্দ শুনে চুপ করে গেলেও ওদের আনন্দের অনুষ্ঠান ঠিকভাবেই চলত। তাতে কোনোরকম ত্রুটি ছিল না।

এই সাত নম্বর ঘরের সমস্ত সাজসজ্জা রাজকুমার প্রসপেনোর রুচি অনুযায়ীই সাজানো হয়েছে, এতেই ওঁর অদ্ভুত ধরনের রুচির পরিচয় আমরা পাই। তাছাড়া তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত অনুষ্ঠনগুলো চলত। এই সব কিছু মিলিয়ে শুধু একটাই পরিবেশ সৃষ্টি হতো যেটা হচ্ছে গতিময় ও ভৌতিক আবহাওয়ার, অবশ্য হারমানি দেখার পর থেকেই রাজকুমারের মাথায় এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনাগুলো এসেছে। তাছাড়া এখানকার মানুষগুলো সবকিছুই দেখলে মনে হয় কোনোকিছু সুস্থ নয়, সব কেমন এলোমেলো, অগোছালো।

নির্জন, নিখুঁত নিরাপদ থাকার দুর্গের মধ্যে সবাই খুবই আনন্দের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস কেটে গেল। হঠাৎ ষষ্ঠ মাস শেষ হওয়ার আগেই সেই

অভিশপ্ত ব্যাধির আক্রমণ শুরু হলো। ঘটনাটা যেদিন ঘটে সেদিন রাজকুমার প্রসপেরো তার হাজারখানেক প্রজার সঙ্গে নাচ গানের আসরে আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিলেন। ঘরগুলো সব যেন ভয়াবহ মনে হতে থাকে। মনে হলো, ঘরের রঙ যেন তারা চুষে নিচ্ছে। হঠাৎ আবলুস কাঠের সেই ঘড়িটার শব্দ বাজতে থাকে যার ফলে বাদ্যযন্ত্রের বাজনা থেমে যায়, চারদিকে নিস্তব্ধ-নীরবতা নেমে আসে। সবাই যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

শব্দটা থামতেই আবার বাদ্যযন্ত্রগুলো বেজে ওঠে; সবাই হাসি-গল্পে মুখর হয়ে ওঠে। আনন্দ-ফুর্তির বন্যা বয়ে চলে। তিনপায়া টুলে রাখা সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের আলো রঙিন কাঁচের জানালাগুলো ভেদ করে ঘরে বিভিন্ন রঙের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। সবগুলো ঘরের মধ্যে সাত নম্বর ঘরটা আরও বেশি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ( উৎসবের রাত ক্রমশ বেড়ে চলে। লাল জানালার কাঁচ খুঁড়ে রক্তের মতো লাল আলো সাত নম্বর ঘরটার কালো রঙের সাজ-সরঞ্জামের উপর এসে পড়তে থাকে আর ঠিক তখনই একটা মূর্তি সাত নম্বর ঘরের কালো কার্পেটে পা রাখে, তার দেহটা লাল আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময়ে আবলুস কাঠের ঘড়িটা সুরেলা ছন্দে বেজে ওঠে, অন্যসব ঘরের লোকেরা সেই শব্দ শুনতে পায়, শুধু সাত নম্বর ঘরটা ছাড়া বাকি ঘরগুলোতে লোকের ভিড়। ওদের এই উৎসব চলে মাঝরাত অবধি।

প্রতিদিনই প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির শব্দে ওদের নাচ, গান, কথাবার্তা সব থেমে যায়। আজ আবার শব্দটা আরম্ভ হতেই রোজকার মতো সব থেমে গেল। মানুষগুলোর মধ্যে একটা

বিহ্বলতা নেমে আসে। তারপর যখন ঘড়িটার শেষ শব্দটা খুব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, ঠিক তখনই ভিড়ের মধ্যে অনেকেই একজন মুখোশধারীর অস্তিত্ব টের পায়, যাকে একমুহূর্ত আগেও দেখা যায়নি। সকলেই এই অদ্ভুত আকৃতির লোকটার উপস্থিতি নিয়ে চাপারে ফিসফিস করে আলোচনা করতে থাকে। সবার চোখে বিস্ময়, তীব্র আতঙ্ক, ভয়ে সবাই মরিয়া হয়ে ওঠে। অদৃশ্য মূর্তিটার আকৃতিটাও বীভৎস, বিরাট লম্বা দৈত্যের মতো দেখতে, পা থেকে মাথা যেন রহস্যের আবরণে ঢাকা, মুখে মুখোশ, পোশাক-পরিচ্ছদগুলো সব ঘন লাল রক্তবর্ণ, দেখলেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

সেই সময় রাজকুমার প্রসপেনোর চোখ ঐ ভূতুড়ে মূর্তিটার উপর গিয়ে পড়ে। মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে কর্কশ গলায় বলে ওঠেন–এতদূর স্পর্ধা?

মূর্তিটা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, রাজকুমার ওর সাহস দেখে খেপে ওঠেন। রুক্ষস্বরে বলেন–ওর স্পর্ধা তো কম নয়। আমাদের উপহাস করছে, অপমান করছে। ওকে তোমরা সবাই মিলে ধরো, ওর মুখোশটা খুলে দাও। তাহলে বুঝতে পারব আগামীকাল ভোরে কাকে আমরা ফাঁসিকাঠে ঝোলাচ্ছি।

রাজকুমার প্রসপেরো পূর্বদিকের নীল ঘরটায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিলেন। আর এই ঘরেই ঘটনার প্রথম সূত্রপাত। ওঁর হাতের ইশারায় সমস্ত বাজনা থেমে গেল। রাজকুমার তখন নিজের দলের লোকজনদের নিয়ে একইভাবে ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। দলের লোকজন মুখোশধারী দৈত্যের দিকে এগিয়ে যায় তাকে ধরার জন্য।

কিন্তু মূর্তিটা সেদিক কোনোরকম লক্ষ্য না করেই এগিয়ে যায় রাজকুমারের দিকে। একটা অজানা আতঙ্কে সবাই থেমে যায়, কারও সাহসে কুলোয় না মূর্তিটাকে জাপটে ধরতে। ততক্ষণে মূর্তিটা রাজকুমার প্রসপেয়োর সবচাইতে কাছের লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র গজখানেকের মতো। এবার মূর্তিটা ঘরের মাঝখানটা পার হয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ভয়ংকর মূর্তিটা নিজের যাওয়ার রাস্তা করে নেয়, ওর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন মাপা আর জোরালো। প্রথমে মূর্তিটা নীল রঙের ঘর থেকে ছুটে যায় বেগুনী রঙের ঘরে, সেখান থেকে যায় সবুজ রঙের ঘরে, তারপর কমলা রঙের ঘরে ঢোকে। এ ঘরে এসে মূর্তিটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

রাজকুমার প্রসপেরোর মধ্যে ক্রোধ আর ভয় দুটোই কাজ করতে থাকে। মনে মনে ভীষণ খেপে ওঠেন। তার সঙ্গে একটা ভয়মিশ্রিত লজ্জা আর অপমানে তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি মূর্তিটার পিছন পিছন ধাওয়া করে চলেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গীরা কেউই তাকে অনুসরণ করে না। রাজকুমার প্রসপেরো মূর্তিটার পিছন পিছন একের পর এক ঘরে ঢোকেন, হাতে তার ঝকঝকে ছুরি, যার তীক্ষ্ণ ফলাটা চর্চ করে ওঠে প্রতিহিংসা, অপমান ও ক্রোধে।

সবশেষে রাজকুমার প্রসপেরো আর দৈত্যটা সাত নম্বর ঘরে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। রক্তের মতো লাল আলো ঘরের মধ্যে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একটু পরে ঘরের

ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ গোটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। রাজকুমারের তীক্ষ্ণ ফলাওয়ালা ছুরিটা কালো কার্পেটের উপর ছিটকে যায় আর রাজকুমার প্রসপেয়োর রক্তাক্ত মৃতদেহটা কালো কার্পেটের উপর আছড়ে পড়ে।

তারপরের ঘটনাগুলো খুবই দ্রুত ঘটে যায়। সবাই তখন আতঙ্কে, ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে। কারও কোনোকিছু করার ক্ষমতা থাকে না। হঠাৎ রাজকুমারের তীক্ষ্ণ চিৎকার ওদের সবাইকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। এবার সবাই মরিয়া হয়ে মনের সাহস জোগাড় করে ছুটে যায় লাল রঙের ঘরটার দিকে। হুড়মুড় করে সবাই ঘরে ঢুকে পড়ে দেখতে পায় সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা, যা দেখে ওরা আতঙ্কে শিউরে ওঠে, মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে যায়।

সবাই আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে দেখে সামনে সেই আবলুস কাঠের ঘড়িটার ঠিক পিছনে লম্বা, বিকট আর ভয়ঙ্কর দৈত্যটা দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় পাথরের খোদাই-করা একটা মূর্তি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। কবর থেকে উঠে আসা মুখোশধারী মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুভয়ে সবার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। প্রত্যেকেই রক্তাক্ত মৃত্যুর উপস্থিতি টের পায়। সবাই বুঝতে পারে এই মূর্তিটা হচ্ছে একটা পিশাচ। মানুষের রক্তেই যার খিদে মেটে। মাঝরাতে যে সকলের অলক্ষ্যে চোরের মতো এই দুর্গে ঢুকে পড়েছে।

তারপর থেকে চলে একের-পর-এক রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড। আর তার সাথে সাত নম্বর ঘরটায় রক্তের স্রোত বয়ে চলে। দুর্গের সবাই মৃত্যুভয়ে দিশেহারা হয়ে ওঠে। এই

ভয়ংকর রক্তাক্ত মৃত্যুর থেকে বাঁচার জন্য সবাই মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু পালানোর কোনো পথই নেই ওদের। এইভাবে একের-পর-এক মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে, তার সাথে দুর্গটা জনশূন্য হয়ে পড়ে। আবলুস কাঠের অদ্ভুত ঘড়িটা স্তব্ধ হয়ে যায়, বাইরের বারান্দায় রাখা জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো নিভে যায়, মানুষহীন দুর্গ জুড়ে একটা রহস্যময় গভীর অন্ধকার নেমে আসে। শুধু এই দুর্গটার মধ্যে বেঁচে থাকে একরাশ অন্ধকার আর মৃত্যু। রক্তাক্ত মৃত্যু তার আধিপত্য বিস্তার করে বেঁচে থাকে এই রহস্যময় দুর্গের মধ্যে। আর তার অভিশপ্ত ব্যাধির বিস্তার ঘটে।

# লিজিয়ার মৃত্যু

লেডি লিজিয়ার সঙ্গে কবে, কীভাবে, কোথায় আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, আমার কিছুই মনে নেই। তারপর অনেক বছর গেছে, অনেক কষ্ট পেয়েছি, স্মৃতি দুর্বল হয়ে এসেছে। অথবা লিজিয়ার দুর্জ্জেয় চরিত্রের সবটুকু আমি ধরতে পারিনি বলেই সব কথা মনে করতে অক্ষম।

লিজিয়া! লিজিয়া! লিজিয়া! শুধু এই নামটি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেই মনের চোখে ভেসে উঠে অতুলনীয় একটি রূপ-ইহ লোকের মায়া যে অনেক আগেই ত্যাগ করেছে। লিজিয়া! লিখতে বসে মনে পড়ছে, সে এসেছিল আমার বান্ধবীরূপে, তারপর বাগদান করে সহায় হয়েছিল আমার পড়াশুনায়। সবশেষে বরণ করেছিল আমাকে স্বামীত্বে।

সব ভুলেছি, ভুলিনি কেবল লিজিয়ার অসামান্য রূপ। দীর্ঘাঙ্গী, কৃশকায়া। চলাফেরা করত হাল্কা চরণে। পড়ার ঘরে ঢুকত লঘুপায়ে ছায়ার মতো, টের পেতাম না। সঙ্গীতের মতো নরম মিষ্ট কণ্ঠে কথা বললে চমক ভাঙত, রোমাঞ্চিত হতাম কাঁধের ওপর মর্মর হাতের স্পর্শে।

লর্ড ভেরুলাম বলেছেন, প্রকৃত রূপ চিনেও চেনা যায় না। সে রূপের মধ্যে এমন অদ্ভুত কিছু থাকে, যা আমাদের অজ্ঞাত, ব্যাখ্যার অতীত। লিজিয়ার মধ্যে আমি এই অজানা বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেছি, কিন্তু খুঁজে পাইনি কেন সে এত শ্রীমতী।

রূপ সম্বন্ধে আমাদের চিরকালের যে সংজ্ঞা, লিজিয়ার রূপ সেই বাঁধাধরা ফরমুলায় পড়ে না। তবুও সে অলোকসামান্য কেন? ললাট নিখুঁত, হাতির দাঁতের মতো সাদা গায়ের চামড়া, দাঁড়কাকের মতো কুচকুচে কালো একরাশ ঢেউ খেলানো চুল। নাকের গড়ন টিকোলো। হিব্রু সুন্দরীদের হার মানা মিষ্টি মুখটি স্বর্গীয় সুধায় রমণীয়। ওষ্ঠের তুলনায় অধর ঈষৎ পুষ্ট, গালের টোল যেন নিজেই মুখর হতে চায়, হাসলেই দেবলোকের বিমল রশ্মিরেখায় যেন ঝলমল করে উঠে পরিপাটি দাঁতের সারি।

সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডাকসাইটে সুন্দরীদের নয়নের মতো নয়, কোনো তুলনাই চলে না। লর্ড ভেরুলাম সৌন্দর্য রহস্যের ব্যাখ্যা করতে যা বলেছেন, অজানা সেই রহস্য বুঝি বিধৃত ওর আকাশ সমান আঁখির মধ্যে। সাধারণ সুন্দরীদের চেয়ে বড়ো চোখ, উজ্জ্বল তারকার মতো প্রদীপ্ত। উত্তেজিত হলেই ভাস্বর হয়ে ওঠে তুলনাহীন এই প্রত্যঙ্গ দুটি। বিচ্ছুরিত হয় অপার্থিব সৌন্দর্য। তখন তা বন্য তাতার সুন্দরীদের চোখের মতোই দুস্তর ঝলমলে। চোখের মণি দুটোয় কালো হীরের দীপ্তি। বড়ো বড়ো চক্ষু পল্লব। বঙ্কিম ভুরু দুটিও কুচকুচে কালো। অদ্ভুত সৌন্দর্যটা কিন্তু চোখের রঙ, দীপ্তি বা গঠন সুষমায় নয়–এ রহস্য ওর চোখের চাহনিতে। কেন ওর চোখের ভাব এত এত রহস্যময়! এত মোহময়! কিছুতেই তল পাইনি নিতর। সেই চাহনির। আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দূর আকাশের যুগল নক্ষত্রর মতো অম্লান থেকেছে ওর সৌন্দর্যের আকর যুগল নয়ন। পূজা করেছি সেই নক্ষত্র দুটিকে, জ্যোতির্বিদের মতো অন্বেষণ করেছি নক্ষত্রের স্বরুপ-ব্যর্থ হয়েছি।

আশ্চর্যসুন্দর রহস্যময় এই নক্ষত্রসম চোখ দুটির দ্যুতিও কিন্তু ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে এল। অসুস্থ হলো লিজিয়া। বন্যচোখ দুটিতে আর সে আভা ফুটল না, বিশীর্ণ আঙুলগুলি মোমের আঙুলের মতো রক্তহীন হয়ে এল। সামান্যতম আবেগেই স্পষ্ট হলো শুভ্র ললাটের নীল শিরা। বুঝতে পারছি, সময় ফুরিয়ে আসছে লিজিয়ার, আমি প্রাণপণে লড়তে লাগলাম মনের সঙ্গে। লড়তে লাগল লিজিয়াও। জীবনের প্রতি অসীম মায়া, জাগতিক সংসারের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ, বেঁচে থাকার তীব্র বাসনা বিমূর্ত হলো ওর মৃদু কণ্ঠস্বরে। ওর সেই অবস্থায় সান্ত্বনার কোনো ভাষা আমি পাইনি।

লিজিয়া আমায় ভালোবাসত। বুক দিয়ে ভালোবাসত। ওর ভালোবাসার গভীরতা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি ওর চিরবিদায়ের পর। মৃত্যুর আগে ধীর স্থির নয়নে আমার পানে চেয়ে মৃদুস্বরে ও আমাকে প্রেমের অমৃত বচনই শুনিয়েছিল। বলেছিল, সেই কবিতাটি আবৃত্তি করবে? আমি অবরুদ্ধ আবেগে শুনিয়েছিলাম ওর স্বরচিত কবিতা।

কবিতা শেষ হলো। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে সটান বিছানায় দাঁড়িয়ে উঠল লিজিয়া। মৃত্যুপথযাত্রীর এত আবেগ সইবে কেন? নিঃশেষিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল শয্যায়। শেষ নিশ্বাস যখন পড়ছে, তখন শুনলাম বাতাসের সুরে ওর আত্মা যেন বিড়বিড় করছে অধরোষ্ঠের ফাঁকে। কান পেতে শুনলাম গ্যানভিলের সেই অমর কথা-ইচ্ছার মৃত্যু নেই। ঈশ্বর স্বয়ং একটা মহান ইচ্ছা। মানুষ দেবলোকে যেতে চায় না-মরার পরেও না-আপন ইচ্ছাশক্তি যতক্ষণ না দুর্বল হচ্ছে।

এই তার শেষ কথা। মারা গেল লিজিয়া। শোকে দুঃখে মুষড়ে পড়লাম আমি। নিঃসঙ্গ পুরীতে থাকতে পারলাম না। ঐশ্বর্য বলতে যা বোঝায়, আমার তার অভাব ছিল না। নশ্বর মানুষ যে সম্পদ কল্পনাও করতে পারে না, আমার তা ছিল। সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল লিজিয়াকে বিয়ে করার পর। তাই মাস কয়েক পরে ঘরছাড়া দিকহারা হয়ে দেশভ্রমণের পর একটা পুরোনো মঠ কিনলাম ইংল্যান্ডের মাটিতে। বিষাদাচ্ছন্ন মঠ। আসবাসপত্রে অনেক স্মৃতি, অনেক ব্যথা, অনেক ইতিহাস বিজড়িত। আমার নিঃসঙ্গ শোকবিধুর মনের উপযোগী পরিবেশ।

ভাঙা মঠের বাইরেটা ভাঙাই রইল, মেরামত করলাম না। কিন্তু ভেতরটা সাজালাম রুচিসুন্দরভাবে দামি দামি জিনিস দিয়ে। আমার তখন মাথার ঠিক নেই। ছেলেমানুষী উন্মাদনায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। মহার্ঘ আসবাসপত্র দিয়ে ঘরসজ্জা আমার চিরকালের বাতিক। নিরালা অঞ্চলের সেই ভাঙা মঠের অভ্যন্তরেও তাই নিয়ে এলাম স্বর্ণখচিত গালিচা, মিশরীয় কারুকার্য, জমকালো পর্দা। শোকাচ্ছন্ন হয়েও আফিমের ঘোরে আমি দিনকয়েক মত্ত রইলাম গৃহ সজ্জা নিয়ে। তারপর একদিন শুভ্রকেশী নীল নয়না লেডি রোয়েনাকে বধূবেশে নিয়ে এলাম সেই বাসভবনে অবিস্মরণীয় লিজিয়ার শূন্য সেই সিংহাসনে বসাতে।

কনে বউয়ের জন্যে যে ঘরটি সাজিয়ে ছিলাম, তার বর্ণনা দিচ্ছি এবার। ঘরটা মঠের শীর্ষদেশে, বুরুজের তলায়। পাঁচকোনা ঘর। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল জোড়া একটা

জানলা। ভেনিস থেকে আমদানি করা প্রকাণ্ড এক খানা রঙিন কাঁচ বসানো জানলায়। সূর্যলোক অথবা চন্দ্রকিরণ সেই কাঁচের মধ্য দিয়ে ভৌতিক প্রভা দিয়ে লুটিয়ে পড়ে ঘরের আসবাবপত্র। বিশাল জানালার ওপরে একটা প্রাচীন আঙুরলতা শ্যাওলা ধরা বুরুজ বেয়ে উঠে গেছে ওপরে। ওক কাঠের কড়িকাঠ অনেক উঁচু। খিলানের আকারে তৈরি। কাঠের গায়ে বহু পুরোনো কিম্ভুতকিমাকার আধা গথিক কারুকাজ। বিষণ্ণ কড়িকাঠের মাঝখানের খিলান থেকে সোনার চেনে ঝুলত একটা সোনার ধুনুচি। সারাসেনিক প্যাটার্নে তৈরি গন্ধ পাত্র। সর্পিল রেখায় অবিরাম বর্ণবিচিত্র অগ্নিশিখা লেলিহান রসনা মেলে ধরত কারুকার্য পরিবৃত রন্ধ্রপথে।

বেশ কয়েকটি তুর্কী পালঙ্ক আর সোনালি শামদান সাজানো ঘরের নানা স্থানে। ভারতবর্ষ থেকে আনিয়েছিলাম নিরেট আবলুস কাঠে নির্মিত নতুন বউয়ের আরামকেদারা, মাথার ওপর ছত্রাকার চন্দ্রাতপ। পাঁচকোণে বসানো পাঁচটা সমাধি-সিন্দুক, ঘন কালো আগ্নেয়শিলা খুদে তৈরি। ডালার ওপর সুপ্রাচীন ভাস্কর্য, সিন্দুকগুলি সংগ্রহ করেছি রাজারাজড়ার সমাধি-মন্দির থেকে। সবচেয়ে জবর ফ্যানটাসি কিন্তু দেওয়াল জোড়া পর্দায়। দানবিক দেওয়ালের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঝুলছে মহার্ঘ বস্ত্রাবরণ, যা গালিচার মতো পুরু, তুর্কী পালঙ্কের চাদরের মতো চিত্র-বিচিত্র, জানালার পর্দার মতো জমকালো। সোনার কাপড় দিয়ে তৈরি এই বস্ত্রাবরণের দাম শুনলে স্মম্ভিত হতে হবে। কুচকুচে কালো কাপড়ের ওপর স্বর্ণচিত্র, ব্যাস এক ফুট, সমান ব্যবধানে আরব্য ইমারতের উদ্ভট নকশা।

ঘরে ঢুকলে প্রথমে নকশাগুলোকে আরব্যদেশীয় মনে হবে। আরো এগোলে নকশার চেহারা পালটে যাবে, যেন বিরাটকায় দানবদল কিম্ভুতকিমাকার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে পায়ে ঘরের মাঝে এলে দানবদলও অদৃশ্য হবে রোমাঞ্চকর পর্দার বুক থেকে। তখন ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে কেবল দুলবে কুসংস্কারের ছায়ামূর্তি। অন্তহীন বিদঘুঁটে মূর্তিগুলোকে মনে হবে মুখ ঢাকা সন্ন্যাসীর দল, নির্নিমেষে নিরীক্ষণ করছে। ঘরের প্রাণীদের। কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পর্দার পেছনে। তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে গা-শিউরোনো অনুভূতি। হাওয়ায় অবিরাম দুলতে থাকে ভারি পর্দা-অলীক কাহিনির বিচিত্র অপচ্ছায়ার মতো মঠবাসীদের কল্পিত আকারগুলিকে মনে হয় সজীব। গায়ে রোমাঞ্চ জাগে সেই দৃশ্য দেখলে, শিরশির করে শিড়দাঁড়া।

বিয়ের প্রথম মাসটা এহেন ঘরেই কাটল। খুব একটা অশান্তি হলো না। নতুন বউ আমার থমথমে মুখ দেখে ভয় পেত, আমার আত্মনিমগ্ন রূপ দেখে দূরে সরে যেত। আমাকে সে ভালোবাসতে পারেনি, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। নিজের মনের অতলে ডুব দিয়ে দিবারাত্র ধ্যান করতাম লিজিয়াকে যে লিজিয়া আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।

চিরবিদায় নিয়েছে বলেই তার রূপ আমার মধ্যে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার আফিমের নেশা ছিল। নেশার ঘোরে স্বপন দেখতাম লিজিয়াকে। কল্পনা করতাম, আহারে, আবার যদি ওকে ফিরিয়ে আনা যেত এই মাটির পৃথিবীতে!

বিয়ের দ্বিতীয় মাসে হঠাৎ অসুস্থ হলো লেডী রোয়েনা। রোগমুক্তি ঘটতে সময় লাগল। ব্যাধির প্রকোপেই বোধ হয় প্রায়ই অনুযোগ করত ঘরের মধ্যে অদ্ভুত পদশব্দের। ছায়া নড়ছে, অদ্ভুত আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। চোখের ভুল কানের ভুল বলে উড়িয়ে দিতাম। স্নায়ু দুর্বল হলে এ-রকম ইন্দ্রজাল অনুভব করে অনেকেই।

বেশ কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠল রোয়ানা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার শয্যাশায়ী হলো। এবার কিন্তু রোগ সারবার লক্ষণ দেখা গেল না। ভয় পেলাম ওর অবস্থা দেখে। শুকিয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন, যেন মিশে গেল বিছানার সাথে। ডাক্তাররাও ধরতে পারল না

অসুখটা। মাঝে মাঝে ছেড়ে যায়, আবার এসে তেড়ে ধরে। ক্রমশ কমে আসতে লাগল প্রাণশক্তি, বৃদ্ধি পেল স্নায়বিক বিকার। সেই অপচ্ছায়ার নড়াচড়া নাকি আবার দেখতে পাচ্ছে-শুনতে পাচ্ছে অদ্ভুত শব্দ। দেওয়ালজোড়া ফ্যানট্যাসটিক পর্দার আড়াল থেকেই এ শব্দ শোনা যায়, সৎ করে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায় পর্দার বুকে।

একদিন রাতে ওর এই অস্বস্তির কথা নিয়ে আমাকে আরো চেপে ধরল রোয়ানা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমকে উঠছিল। আমি উদ্বিগ্ন চোখে দেখছিলাম বিশীর্ণ মুখের ভাবতরঙ্গ। পালঙ্কের পাশে রাখা আবলুস কাঠের কেদারায় বসেছিলাম আমি। ঘুম ভাঙল রোয়ানার। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বলল, শব্দটা নাকি আবার শোনা যাচ্ছে। আমি কিন্তু কিছু শুনলাম না। বলল, অপচ্ছায়াকে আবার দেখা যাচ্ছে, আমি কিন্তু কাউকে দেখলাম না। হাওয়ায় পর্দা

দুলছিল। ভাবলাম, ওকে বুঝিয়ে বলি, প্রায় অশ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পর্দার খসখসানি ছাড়া কিছু নয়। পর্দার বিমঘুঁটে মূর্তিগুলো দুলে দুলে উঠছে বলে মনে হচ্ছে, কে যেন সরে যাচ্ছে পর্দার আড়ালে।

রোয়ানার মুখ কিন্তু নিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। মানুষ মরে গেলে মুখ যে রকম সাদা হয়ে যায়, রোয়ানার মুখের অবস্থা তখন তাই। মনে হলো, এই বুঝি জ্ঞান হারাবে। কাছাকাছি চাকর-বাকর নেই যে ডাকব। মনে পড়ল, হঠাৎ দরকারের জন্যে ঘরের মধ্যেই এক বোতল মদ রেখে গিয়েছিলেন ডাক্তার। তাই দৌড়ে গেলাম ঘরের অপর প্রান্তে সুরার আধার আনতে। মাথা ওপর ঝুলন্ত সোনার গন্ধপাত্রের তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে একই সময়ে দুটো বিচিত্র অনুভূতি সাড়া জাগিয়ে গেল আমার লোমকূপে।

স্পষ্ট মনে হলো কে যেন আলতো করে আমার গা ঘষটে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, ধুনুচির তলায় আলোকবলয়ের মধ্যে স্বর্গের পরীর মতো একটা আবছা অস্পষ্ট ছায়া। ছায়ার ছায়া যদি কিছু থাকে-দ্যুতিময় সেই ছায়াটা যেন তাই।

কিন্তু আমি নিজে তখন আফিমের ঘোরে, তাই এ সব কথা রোয়ানাকে না বলাই সমীচীন মনে করলাম। মদিরাপত্র এনে পেয়ালায় ঢেলে তুলে ধরলাম ওর ঠোঁটের কাছে। তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে রোয়ানা। মদিরার পেয়ালা আমার হাত থেকে নিয়ে ধরল ঠোঁটের কাছে।

আমি বসলাম আবলুস কাঠের আরামকেদারায়। চোখ রইল রোয়ানার ওপর। ঠিক এই সময়ে আমার সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করলাম আবার সেই মায়াস্পর্শ। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে যেন লঘু চরণে হেঁটে এল কার্পেটের ওপর দিয়ে, এগিয়ে গেল কেদারার পাশ দিয়ে। ঠিক তখনি পেয়ালাটা উঁচু করে ধরেছে রোয়ানা। আমার চোখের ভুল কিনা জানি না, কিন্তু বেশ দেখলাম যেন শূন্যমার্গের কোন নিঝরিণী উৎস থেকে সহসা আর্বির্ভূত হলো চার-পাঁচটা টলটলে চূণীর মতো অত্যুজ্জ্বল তরল বিন্দু এবং টপটপ করে খসে পড়ল পেয়ালার সুরায়।

রোয়ানা কিছু দেখল না। এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করে ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। আমি ভাবলাম, দেখেছি তা আফিমের প্রভাবে দেখেছি। রাত্রি নিশীথে আতঙ্কিত স্ত্রীকে সামনে রেখে নিজেই ইন্দ্রজাল দর্শন করছি।

একটা ব্যাপার কিন্তু আমার মনের কাছে গোপন করতে পারলাম না। রুবীর ফোঁটা সুরার মধ্যে ঝড়ে পড়ার পর থেকেই আরো খারাপ হলো স্ত্রীর শরীর। তৃতীয়রাতে দাসীরা তাকে কবরে শোয়ার পোশাক পরিয়ে দিল। চতুর্থ রাতে তার চাদর ঢাকা প্রাণহীন দেহ সামনে নিয়ে পাথরের মতো বসে রইলাম।

অদ্ভুত সেই কক্ষে অনেক উদ্ভট দৃশ্য যেন আফিমের ঘোরে ছায়ার মতো কল্পনায় ভেসে গেল। ঘরের পাঁচ কোণে রাখা পাঁচটি শবাধারের পানে চাইলাম অশান্ত চোখে। দেখলাম, দুলন্ত পর্দার গায়ে কিম্ভুতকিমাকার মূর্তিগুলোর নড়াচড়া, মাথার ওপরে ধুনুচি ঘিরে সর্পিল

আগুনের কুণ্ডুলী। সেখান থেকে দৃষ্টি নেমে এল তলায়, মেঝের ওপরে। দুরাত আগে যেখানে দেখেছিলাম অপার্থিব এক জ্যোতির্ময় ছায়ার অস্পষ্ট আদল। কিন্তু এখন সে স্থান শূন্য। এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দেখছিলাম, এবার স্বচ্ছন্দ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস।

সহজভাবে তাকালাম শয্যায় শায়িতা পাণ্ডুর আড়ষ্ট দেহের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লিজিয়ার স্মৃতি ভিড় করে এল মনের মধ্যে। মনে পড়ল, এমনিভাবে আর এক রাতে তার প্রাণহীন দেহ সামনে নিয়ে নিথরভাবে বসে থেকেছি আমি। মনে পড়ল হাজার হাজার মিষ্টি মধুর বেদনাবিধুর ঘটনা। রাত বয়ে চলল। তিক্ত স্মৃতিভারে তন্ময় হয়ে গেলাম-লিজিয়ার ধ্যানে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হলাম।

মাঝরাত নাগাদ একটা চাপা, হ্রস্ব, মধুর, কিন্তু স্পষ্ট ফোঁপানির শব্দে সম্বিত ফিরে এলো। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করলাম, শব্দটা এসেছে আবলুস কেদারা থেকে। কুসংস্কারের আতঙ্ক পেয়ে বসল আমায়, উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু মৃত্যু কেদারা থেকে আর কেউ ফুঁপিয়ে উঠল না। আড়ষ্ট হয়ে চাইলাম নিষ্প্রাণ দেহের দিকে, কিন্তু নিস্পন্দ দেহে সামান্যতম চাঞ্চল্যও দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আমার ভুল হয় নি। যতক্ষণই হোক না কেন, ফোঁপানির শব্দ আমি ঠিকই শুনেছি বলেই ধ্যান থেকে জেগে উঠেছি। তাই মনটা শক্ত করে নিমেষহীন চোখে চেয়ে রইলাম মৃত স্ত্রীর পানে।

অনেকগুলো মিনিট কাটল বিনা ঘটনায়। তারপর শুরু হলো আর এক। অলৌকিক রহস্যের খেলা। ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে এল দুই গাল। খুব আবছা হলেও রক্তাভা চোখ এড়ালো না আমার, সেই সঙ্গে দেখলাম রক্তের খেলা বসে যাওয়া চোখের পাতায়। হাত-পা অবশ হয়ে এল আমার সেই অসম্ভব দৃশ্য দেখে। মনে হলো, এই বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড।

তীব্র কর্তব্যবোধ শেষ পর্যন্ত মাথা চাড়া দিল মনের মধ্যে। বেশ বুঝলাম, রোয়ানা মারা যায়নি। এখনো বেঁচে আছে। এখুনি কিছু উপাসনার দরকার। কিন্তু-চাকর-বাকরেরা থাকে মঠের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, আমার ডাক সেখানে পৌঁছোবে না। উঠে গিয়েও তাদের ডেকে আনতে সাহস পেলাম না।

তাই একাই সূক্ষ্মদেহী রোয়ানার আত্মাকে আহ্বান জানালাম, সে তো এখনো যায়নি, আছে আমার কাছেই, আকুল আহ্বান জানালাম দেহপিঞ্জরে ফের ফিরে আসতে। কিন্তু দেখতে দেখতে রক্তাভা মিলিয়ে গেল চোখের পাতা আর গালের চামড়া থেকে। আবার মৃত্যুর ভয়াবহতা প্রকট হলো চোখে মুখে। আবার মার্বেল-সাদা হয়ে গেল মুখখানা, দাঁতের ওপর চেপে বসল নিরক্ত অধরোষ্ঠ। তুহিনকঠিন দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেঁপে উঠলাম থরথর করে, এলিয়ে পড়লাম কেদারায় এবং আবার তন্ময় হয়ে গেলাম লিজিয়ার কামনাতপ্ত স্মৃতি-জাগরণে।

এক ঘণ্টা পর আবার অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম। শয্যার দিক থেকে এসেছে। শব্দটা। নিঃসীম আতঙ্কে উৎকর্ণ হয়ে রাইলাম। এবার আর ভুল হলো না। স্পষ্ট শুনলাম, কে যেন পাজর খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছুটে গেলাম মড়ার পাশে। দেখলাম-স্পষ্ট দেখলাম, ঠোঁটটা থিরথির করে কাঁপছে।

এক মিনিট পরেই কিন্তু শিথিল হয়ে গেল অধরোষ্ঠ, ফাঁক দিয়ে দেখা গেল মুক্তাদাঁতের ঝকঝকে সারি। এবার আতঙ্কে চোখ আমার ঝাপসা হয়ে এল। ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। অতি কষ্টে সামলে রাখলাম নিজেকে। কর্তব্য করতেই হবে-ভয় পেলে চলবে না।

এবার প্রাণের হালকা আভা প্রকাশ পেল ললাটে, গালে, গলায়। উষ্ণতায় আচ্ছন্ন হলো সারা দেহ। এমন কি মৃদু মৃদু স্পন্দিত হলো বক্ষদেশও।

বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! লেডি বেঁচে আছে! দ্বিগুণ উৎসাহে ওকে পুরোপুরি সজীব করার জন্যে হাত-পা-রগ ঘষতে লাগলাম। ডাক্তারি জানি না, আনাড়ীর মতোই করে গেলাম। কিন্তু বৃথা হলো প্রচেষ্টা।

আচম্বিতে অদৃশ্য হলো রক্তিমাভা, স্তব্ধ হলো বক্ষস্পন্দন, দাঁতের ওপর আড়ষ্ট হয়ে গেল অধরোষ্ঠ। মুহূর্তের মধ্যে আবার মড়ার মতোই কঠিন, শীতল, বীভৎস হয়ে উঠল দেহের প্রতিটি রেখা, সমাধি মন্দিরে ছাড়া অন্যত্র যার স্থান নেই।

আবার নিমগ্ন হলাম লিজিয়ার ধ্যানে। আবার ফোঁপানি শুনলাম আবলুস শয্যার দিক থেকে।

রাত তখন ফুরিয়ে এসেছে। আগের চাইতেও স্পষ্টভাবে নড়ে উঠল নিষ্প্রাণ দেহটা। আমি কিন্তু নড়লাম না, উদাত আবেগের টুটি টিপে ধরে অতি কষ্টে বসে রইলাম কেদারায়। আগের মতোই রঙের ছোঁয়া লাগল কপোলে, কপালে। উষ্ণতায় চঞ্চল হলো সারা দেহ, স্পন্দিত হলো বক্ষদেশ, কম্পিত হলো চক্ষুপল্লব। তবুও আমি নড়লাম না।

রোয়ানার শরীরে তখনো কফিনের সাজ, ব্যান্ডেজ এবং অন্যান্য বস্ত্র। কফিন-সজ্জা না থাকলে রোয়েনাকে জীবন্তই বলা যেত। কিন্তু অচিরেই আমার মনের সব দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে এল দেহটা। খলিত চরণে টলতে টলতে দু হাত সামনে বাড়িয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে পৌঁছোলো চাদরমোড়া নারীমূর্তি। তবুও আমি নড়লাম না, শিউরে উঠলাম না। কারণ, অনেকগুলো অবর্ণনীয় কল্পনা যুগপৎ আছড়ে পড়ল আমার মস্তিষ্কে। চলমান মূর্তির চালচলন, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা যেন অসাড় করে দিল আমার মগজ।

আমি পাথর হয়ে গেলাম। একচুলও না নড়ে বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে রইলাম প্রেমূর্তির দিকে। কে এই শরীরী রহস্য? রোয়ানা? কিন্তু এ সন্দেহ কেন আসছে মাথার মধ্যে?

শুভ্রকেশী নীলনয়না রোয়ানা নয় আগুয়ান ঐ নারী মূর্তি, এমন উদ্ভট ধারণা কেন পীড়িত করছে আমার মস্তিষ্ক? মুখের ওপর ব্যান্ডেজের পটি আছে ঠিকই, কিন্তু সঘন নিঃশ্বাসে প্রাণময় ও-মুখ লেডী রোয়ানার না হয়ে অন্যের হতে যাবে কেন? রক্তিম ঐ কপোল তো রোয়ানারই, জীবনের মধ্যাহ্নে প্রাণ সূর্যের আলোক ছিল যেভাবে, ঠিক সেইভাবে গোলাপি ও গাল রোয়ানার ছাড়া আর কারো নয়। ঐ চিবুক, ঐ টোলও নিশ্চয় রোয়ানার। কিন্তু...কিন্তু...অসুখে ভুগে কি মাথায় লম্বা হয়ে গিয়েছে রোয়ানা? একি উন্মত্ত চিন্তা পেয়ে বসেছে আমাকে? ক্ষিপ্তের মতো ধেয়ে গেলাম, ছিটকে পড়লাম তার পায়ের ওপর।

আমার ছোঁয়া পেতেই মাথা থেকে কদর্য কফিন-সজ্জা খুলে ফেলে দিল সে, ব্যান্ডেজের আড়াল থেকে মেঘের মতো পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল একরাশ চুল, সে চুল মধ্যরাতের দাঁড়কাকের ডানার চেয়েও কুচকুচে কালো!

তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল শরীরী রহস্য।

বুকফাটা হাহাকার করে উঠলাম আমি–এবার চিনেছি...চিনেছি তোমায়...কৃষ্ণকালো বড়ো বড়ো এ চোখ যে আমার হারিয়ে যাওয়া প্রেয়সী ..লেডি লিজিয়ার!

# স্ফিংক্স

নিউইয়র্কে যখন ভয়াবহ কলেরার মড়ক চলছে, তখন আমার এক আত্মীয়ের নেমন্তন্ন রাখতে তাঁর বাড়ি গিয়ে দিন পনেরো কাটিয়ে এসেছিলাম। বাড়িটা কটেজ প্যাটার্নের। হাডসন নদীর পাড়ে।

গ্রীষ্মবকাশ কাটানোর সমস্ত আয়োজনই মজুদ ছিল সে অঞ্চলে। ইচ্ছেও ছিল হেসেখেলে ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে দেবো। চারপাশের জঙ্গল দেখা, বসে বসে ছবি আঁকা, নৌকা নিয়ে অভিযানে বেরোনো, ছিপ ফেলে মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, গান গাওয়া আর বই পড়া–গ্রীষ্মবকাশ পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যেত এতগুলো মজার মধ্যে থাকলে।

কিন্তু তা তো পারছিলাম না। রোজই লোক-গিজগিজ শহর থেকে গা কাঁপানো খবর পৌঁছাচ্ছিল কটেজে। চেনা জানাদের মধ্যে কেউ না কেউ পরলোক চলে যাচ্ছেন রোজই–এ খবর কানে শুনলে আর স্থির থাকা যায়? মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে প্রতিদিনই খবর পেতাম, একজন না একজন বন্ধু মায়া কাটাচ্ছেন।

এরপর থেকে খবর নিয়ে কাউকে আসতে দেখলেই শিউরে উঠতাম। দক্ষিণের বাতাসেই যেন মরণের বিষ ঢুকে বসে আছে। মৃত্যু ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। মৃত্যু চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে থাকতাম সর্বক্ষণ। এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখতাম মরণকে।

আমার গৃহস্বামী আত্মীয়টি অবশ্য অন্য ধাচের মানুষ। আমার মতো সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন না। রোজ রোজ চেনাজানাদের চলে যাওয়ার খবর শুনতে শুনতে বেশ মুষড়ে পড়লেও ভেঙে পড়েননি। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই তিনি মেধাবী বলে নাম কিনেছিলেন–তাই বলে অবাস্তবতাকে পাত্তা দিতেন না। আতঙ্ক যখন কায়া গ্রহণ করত, তখন তিনি তার মোকাবিলা করার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে যেতেন–কিন্তু বিচলিত হতেন না আতঙ্কের ছায়া দেখলে।

আমার গুম-মেরে-থাকা অবস্থাটা কাটিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টাই উনি। করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। পারবেন কী করে? ওঁকে না জানিয়ে ওঁরই। লাইব্রেরি থেকে এমন কয়েকখানা বই এনে রোজ পড়তাম–যা আমার মনের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা কুসংস্কারের বীজগুলোকে পরম পুষ্টি জুগিয়ে চলেছিল। দিনরাত এত উদ্ভট কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতাম সেই কারণেই। কারণটা উনি ধরতে পারেননি।

আমার বাতিক ছিল অনেক। তার মধ্যে একটার কথা বলা যাক। অশুভ ঘটনার পূর্বলক্ষণে আমি বিশ্বাস করতাম। এই সংকেত আসে আচমকা এবং তারপরে সত্যি সত্যিই তা ঘটে যায়। এই কটেজে আসার পর এইরকমই একটা অশুভ পূর্বলক্ষণ আমি দেখেছিলাম যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। ঘটনাটার মধ্যে ভাবী অমঙ্গলের স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলাম বলে তাকে ভিত্তিহীন কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি। ভয়ে

কাঁটা হয়ে। থাকতাম সর্বক্ষণ; মাথার মধ্যেও যেন সব ঘোঁট পাকিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে অষ্টপ্রহর থ হয়ে থাকতাম বলে আত্মীয় বন্ধুকে এ বিষয়ে বলার মুরোদও হয়নি।

সেদিন খুব গরম পড়েছিল। বিকেল নাগাদ কোলের ওপর একটা বই রেখে খোলা জানালা দিয়ে দেখছিলাম দূরের পাহাড়। নদীর পাড়ের ওপারে এই পাহাড়ের গায়ে ধস নামার ফলেই বোধহয় গাছপালার বালাই আর নেই। একদম ন্যাড়া হয়ে রয়েছে। বইয়ের পাতায় চোখ রেখেও আমি ভাবছিলাম শহরের কথা-মৃত্যুরাজ সেখানে রোজই নৃত্য করে চলেছেন–মন থেকে তা কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। তাই চোখ উঠে গিয়েছিল বইয়ের পাতা থেকে–দৃষ্টি মেলে ধরেছিল নদীর পাড়ের ওপর দিয়ে দূরের নগ্ন পাহাড়ের দিকে।

কদাকার চেহারার একটা জীবন্ত দৈত্যকে দেখতে পেয়েছিলাম ঠিক সেই সময়ে। পাহাড় চুড়া থেকে সরসরিয়ে নেমে এসে নিচের ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মিনিট কয়েকের মধ্যে।

বিকট সেই জীবকে প্রথমে দেখেই ভেবেছিলাম বুঝি পাগল হয়ে গেছি নির্ঘাৎ। অথবা চোখের গন্ডগোল হয়েছে–ভুল দেখছি নিশ্চয়।

বেশ কয়েক মিনিট ঠায় সজীব আতঙ্ককে নজরে রাখার পর বিশ্বাস ফিরে এসেছিল চোখ আর মাথার সুস্থতায়। আমি পাগলও হইনি, দৃষ্টিবিভ্রমেও ভুগছি না। যা দেখছি সত্যি।

কুৎসিত সেই দানবের বর্ণনা শোনবার পর পাঠক অবশ্য আমাকে পাগলই বলবেন– অথবা বলবেন স্বপ্ন দেখেছি নিশ্চয়। অথচ বিকটাকারকে অনেকক্ষণ ধরে ধীরস্থির শান্তভাবেই চোখে চোখে রেখেছিলাম–উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দিইনি। সুতরাং ভুল দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

জঙ্গলের সব গাছ তো ধস নামার ফলে ধ্বংস হয়নি-কয়েকটা মহীরুহ মাথা তুলে ছিল রাজার মতোই। এদের পাশ দিয়ে চলমান দুঃস্বপ্ন অদৃশ্য হয়েছিল বলেই তার সাইজটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলাম। সমুদ্রের সবচেয়ে বড়ো জাহাজের চেয়েও অনেক বড়ো তার কলেবর। জাহাজের উপমা দেওয়ার কারণ আছে। জাহাজের খোলের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা যায় সেই ভয়ঙ্করকে। তার মুখখানা বসানো রয়েছে ষাট সত্তর ফুট লম্বা একটা শুড়ের ডগায় হাতির শরীর যত মোটা, শুঁড়ের ব্যাসও তাই। শুড়ের গোড়ায় থুথুক করছে বিস্তর কালো চুল–এক কুড়ি মোষের গা থেকেও অত কালো লোম পাওয়া যায় না। লোমশ অঞ্চল থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে মাটি মুখো হয়ে রয়েছে দুটো প্রকাণ্ড দাঁত-বুনো শুয়োরের দাঁতের চেয়েও অনেক বড়ো আর নৃশংস। পড়ন্ত রোদ ঠিকরে যাচ্ছিল এই গজাল দাঁত থেকে। প্রকাণ্ড অঁড়ের সমান্তরালে সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে ঝকঝকে, স্বচ্ছ কৃস্টাল দিয়ে তৈরি দুটো অদ্ভুত জিনিস; রয়েছে সঁড়ের দুপাশে–ঠিক যেন দুটো প্রিজম–খাঁটি কৃস্টাল দিয়ে তৈরি। লম্বায় প্রতিটা তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট। পড়ন্ত রোদ তা থেকে ঠিকরে এসে এত দূরেও চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে আমার। ধড়খানা তৈরি হয়েছে গোঁজের মতো। গোঁজের মাথা রয়েছে মাটির দিকে। দুপাশ দিয়ে বেরিয়েছে দুজোড়া ডানা। রয়েছে ওপর-ওপর। ধাতুর আঁশ দিয়ে ছাওয়া প্রতিটা ডানা।

প্রতিটা আঁশের ব্যাস দশ থেকে বারো ফুট। শক্ত শেকল দিয়ে আটকানো রয়েছে ওপরের আর নিচের ডানা।

লোমহর্ষক এই জানোয়ারটার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তার বুকজোড়া একটা ছবি। মড়ার মাথার ছবি। চোখ ধাঁধানো সাদা রঙ দিয়ে যেন নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে মস্ত কালো বুক জুড়ে। বাহাদুরি দিতে হয় শিল্পীকে।

বীভৎস জীবটাকে মিনিট কয়েক দেখার পর, বিশেষ করে বুকজোড়া মড়ার খুলি আমার গা-হাত-পা ঠান্ডা করে দেওয়ার পর–আতঙ্কে আমি হিম হয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করছিলাম, খুব শিগগিরই একটা অকল্পনীয় বিপদ আসছে। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে অমূলক আশঙ্কাটাকে মন থেকে তাড়াতে তো পারিইনি–উলটো আমাকে স্থাণু করে রেখেছিল ওই কয়েকটা মিনিট।

বিমূঢ় চোখে বীভৎস সেই আকৃতি দেখতে দেখতে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। আচমকা হাঁ হয়ে গেল শুড়ের ডগায় বসানো দানব-মুখের দুই চোয়াল–ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল এমনই একটা বিকট নিনাদ যা নিরতিসীম শোকবিষণ্ণ–যে শব্দের তুলনীয় হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও কেউ শুনেছে বলে আমার জানা নেই।

ওই একখানা অপার্থিব হাহাকারই যেন গজাল ঠুকে বসিয়ে দিল আমার বিকল স্নায়ুমন্ডলীর গোড়ায়। জঙ্গলের আড়ালে তার দানব-দেহ বিলীন হতে না হতেই জ্ঞান হারিয়ে আমি লুটিয়ে পড়লাম মেঝের ওপর।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর প্রথমেই ভেবেছিলাম–যা দেখেছি, যা শুনেছি–সবই বলব বন্ধুকে। কিন্তু তারপর ঠিক করলাম–দরকার নেই।

দিন তিন চার পরে আরেক বিকালে জানালার ধারে একই চেয়ারে বসে ন্যাড়া পাহাড়ের দিকে চেয়েছিলাম আমি। পাশে আমার প্রিয় বন্ধু। পরিবেশ আর সময়ের প্রভাব আগল খুলে দিয়েছিল আমার মনের। বলেছিলাম, কী দেখেছি কি শুনেছি কদিন আগে। শুনে অট্টহাসি হেসেছিল বন্ধুবর। তারপর বড্ড বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় ভাবছিল, নির্ঘাৎ গোলমাল দেখা দিয়েছে আমায় মাথায়।

আর ঠিক তখনি ভয়াবহ সেই প্রাণীটাকে আবার দেখতে পেলাম ন্যাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে নিচের জঙ্গলের দিকে। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। আঙুল তুলে বন্ধুকে দেখতে বলেছিলাম। সে কিছুই দেখতে পায়নি। শুধু আমিই দেখেছিলাম, একই রকম রক্ত জমানো গতিভঙ্গিমায় মূর্তিমান আতঙ্ক এগিয়ে চলেছে নিচের মহীরুহগুলোর দিকে।

কী ভয় যে পেয়েছিলাম, তা ভাষা দিয়ে লিখে বোঝাতে পারবো না। স্পষ্ট বুঝেছিলাম, বিকট বিভীষিকা পর-পর দুবার আমাকেই চেহারা দেখিয়ে গেল শুধু একটা আসন্ন ঘটনারই পূর্বাভাস দিতে। আমার মৃত্যুর আর দেরি নেই। অথবা বেঁচে থেকেও মরে যাওয়ার চাইতে বেশি যন্ত্রণা পাবো পাগল হয়ে গিয়ে। এ তারই দানবীয় সংকেত! এলিয়ে পড়েছিলাম চেয়ারে। দুহাতে মুখ ঢেকে ধরে করাল সংকেতকে আর দেখতে চাইনি। চোখ থেকে একটু পরে হাত সরিয়ে নেওয়ার পর তাকে আর দেখতেও পাইনি–বনতলে বিলীন হয়েছে অমঙ্গলের আগন্তুক।

আমার বন্ধু কিন্তু আরো শান্ত হয়ে গেল এই ঘটনার পর। খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, বিকট জীবটাকে দেখতে কীরকম। হুবহু বর্ণনা দিয়েছিলাম। তারপর আমাকেই শুনতে হলো তান জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। যার সারবত্তা এই : সব মানুষই এক জায়গায় ভুল করে বসে; দূরের জিনিসকে কাছে এনে আর কাছের জিনিসকে দূরে রেখে দেখার তফাৎ ধরতে পারে না। হয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ধারণা করে নেয়-না হয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বসে। বর্তমান গণতন্ত্রই তার প্রমাণ।

বলতে বলতে উঠে গিয়ে বুককেস থেকে একটা বই নামিয়ে এনেছিল বন্ধু। প্রাকৃতিক ইতিহাস-এর বই। পড়তে সুবিধে হবে বলে, এসে বসেছিল আমার চেয়ারে–আমাকে বসিয়েছিল ওর সোফায়। জানালার ধারে পড়ন্ত আলোয় বই খুলে ধরে প্রথমেই লেকচার দিয়েছিল এইভাবে : তোমার বিশদ বর্ণনা না শুনলে, দানবটা আসলে কী–তা কোনওদিনই আঁচ করতে পারতাম না। যাক সে কথা, আগে শোনো একটা পোকার

শরীরের বর্ণনা। স্ফিংক্স প্রজাতির পোকা, ইনসেকটা শ্রেণির, লেপিডোপটেরা গোষ্ঠীর, ক্রিপসকিউলেরিয়া ফ্যামিলির এই পোকার কথা সব স্কুলের বইতেই আছে। শোনো :

চারটি ডানা ধাতু রঙের আঁশ দিয়ে ছাওয়া; চোয়াল লম্বা হয়ে গিয়ে শুঁড়ের আকার নিয়েছে–মুখ আছে তার ডগায়; এর দুপাশে আছে ম্যানিবল আর প্যালপি-র দুটো অবশিষ্টাংশ; নিচের ডানার সঙ্গে ওপরের ডানা লেগে থাকে একটা লম্বা চুলের মাধ্যমে; অ্যান্টেনা দেখতে লম্বাটে গদার মতো–ঠিক যেন একটা প্রিজম্; উদর ছুঁচালো; বুকে আঁকা মড়ার খুলি দেখে আর করুণ কাতরানি শুনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ভয় পায়।

এই পর্যন্ত পড়ে, বই মুড়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল বন্ধুবর–ঠিক যেভাবে যে কায়দায় বসে একটু আগে আমি দেখেছি লোমহর্ষক ভয়াবহকে।

সোল্লাসে বলল তারপরেই–এই তো...স্পষ্ট দেখছি...পাহাড় বেয়ে ফের উঠছে আশ্চর্য প্রাণী ঠিকই–তবে যতটা বড়ো আর যত দূরে আছে বলে মনে করেছিলে–কোনওটাই ঠিক নয়। জানালার কাঁচে ঝুলছে মাকড়সার জালের সুতো। সুতো ধরে ওপরে উঠছে। আমার চোখের কনীনিকা থেকে তার এখনকার দূরত্ব এক ইঞ্চির ষোলভাগের একভাগ; গোটা শরীরটাও লম্বায় এক ইঞ্চির ষোলোভাগের একভাগের বেশি নয়।

# হানাবাড়ি

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বরিশাল শহর ছিল নিতান্তই একটি মফস্বল। শহরটিকে পাড়া গাঁয়ের একটু উঁচু সংস্করণ বলা যায়। শহরের শেষ মাথায় ছিল কেদার চাটুজ্যের পোড়ড়া ভিটে। এ গল্পের যখন শুরু তারও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চাটুজ্যে মারা গেছেন। তারপর থেকে ওই পোড়ড়া ভিটেতে কেউ বাস করার সাহস পায়নি। তখন অবশ্য এত ঘনবসতি ছিল না। শহরগুলোয় কাজেই বাড়ি ফাঁকা পেলেই সেখানে বসত গড়ার ফন্দিও কেউ করত না। আর কেদার চাটুজ্যের পোড়ড়া ভিটের ধারেকাছেও কেউ যেত না ভয়ে। কারণ লোকে বলত ওই বাড়িটি নাকি একটা হানাবাড়ি।

চাটুজ্যে বংশের সকলের ছিল অগাধ টাকা পয়সা। এখন নাকি চাটুজ্যের শেষ বংশধর কেদার চাটুজ্যে মরে যক্ষ হয়ে নাকি ওই সব টাকাকড়ি আগলাচ্ছে। ধনরত্নের লোভে কেউ ওই বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেষলেই যক্ষ রেগে গিয়ে তার গলা টিপে মেরে ফেলে!

এই কথাটা এই অঞ্চলের সব লোকই বিশ্বাস করে। তাই রাতে তো দূরের কথা, দিনের বেলাতেও কেউ ওই বাড়ির কাছে ঘেঁষে না।

তাছাড়া বাড়িটার চারদিকের আবহাওয়াও কেমন যেন রহস্যময়।

বহু পুরোনো বাড়িটা। ইটগুলো সব দাঁত বের করে আছে। চুন সুরকি সবই বহুদিন হলো খসে পড়েছে। বাড়ির পেছনের দিকের অর্ধেকটা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

তাছাড়া চারদিকে অদ্ভুত এক নির্জনতা। অন্ধকার যেন ডানা মেলে বাড়িটাকে গ্রাস করে বসে আছে।

শহরের একেবারে প্রান্তে–তাই চারদিকই বনজঙ্গলে ভর্তি। সামনেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ঝুরি নামিয়ে চারদিকে ছায়া করে রেখেছে। এছাড়াও আসশেওড়া, আমলকী, শিয়ালকাঁটা আর কাঁটানটে গাছের ঝোঁপের বাড়িটা বোঝাই। পেছন দিকেও দুতিনটে নারিকেল গাছ আর একটা বিশাল আম গাছ।

সন্ধ্যার পরই চারদিকে অদ্ভুত নৈশব্দ থম থম করে। এমন কী একটা আলো পর্যন্ত জ্বলে না কোথাও।

রাতের বেলা মাঝে মাঝেই শোনা যায় অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ।

পথ চলতি লোক কেউ এ শব্দ শুনলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায়।

লোকে বলে, যক্ষেরা নাকি শব্দ করে করে মোহর গুনতে থাকে, তাই এই শব্দ। যদি কেউ ভুলেও এ সময় ওই পথে পা বাড়ায় তবে তার আর রক্ষা নেই।

এই সব কারণেই গত বিশ বছরের মধ্যে কেউ কখনও ওই চাটুজ্যে বাড়িতে পা দেয়নি। দরকার কী বাপু বিনা কারণে নিজের জীবনটা খুইয়ে!

দিন পনেরো কুড়ি হলো শহরে দুজন নতুন গুণ্ডা বদমাইশ লোক এসেছে। কখন আবার কী আপদ বিপদ ঘটে ঠিক নেই। শহরের লোক তাই ভয়ে সন্ত্রস্ত।

বলরাম মুখুজ্যে গরীব ব্রাহ্মণ।

শহরের এককোণে তার একটা ছোট্ট মুদি দোকান আছে। তাতে যা সামান্য কিছু আয় হয়, তাতেই চলে তার সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা।

সেদিন অমাবস্যার রাত।

দোকানের কাজকর্ম শেষ করে একহাতে একটা ছোট্ট টিমটিমে লণ্ঠন আর অন্য হাতে একটা লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করতে করতে তিনি চলেছিলেন নিজের বাড়ির দিকে। রাত নটা বেজে গেছে।

পথ নির্জন। কেদার চাটুজ্যের পোড়ড়া ভিটের পাশ দিয়েই এই পথটা।

হঠাৎ বলরাম মুখুজ্যে দেখলেন শহরে নতুন আসা সেই দুজন গুণ্ডা বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলেছে বিড় বিড় করে কী যেন বলতে বলতে।

বলরাম মুখুজ্যে একটা গাছের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন ওদের কথাবার্তা।

হানাবাড়ির কথাই ওরা বলাবলি করছিল।

একজন বলল, চল এক্ষুণি যাই। ওই কোণের ঘরটায় কাল রাতে গিয়েছিলাম। শাবল দিয়ে একটা চাঙড় তুলতেই একটা কাঠের সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেলাম। সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে নামতে একটা মস্তবড় অন্ধকার চোরকুঠুরী। তার মধ্যে তিন ঘড়া মোহর বসানো আছে।

অন্য গুন্ডাটি বলল, তা হলে ওই যক্ষ টক্ষ সব বাজে কথা?

আগের গুন্ডাটা হেসে বলল, দূর, ওসব কিছু না। যত সব ইঁদুর চামচিকা, ছুঁচো ওই মোহর গুনছে।

অন্য গুন্ডাটা হো হো করে হেসে উঠে বলল, চল তবে। বলরাম মুখুজ্যে সমস্ত কথা শুনলেন।

কেমন একটা কৌতূহল হলো তাঁর। লোভও যে কিছুটা না হলে এমন নয়।

তিনি ভাবলেন গুন্ডাগুলো চলে গেলে যদি গোটাকয়েক মোহরও তিনি খুঁজে আনতে পারেন, তবে তাঁর মতো একজন গরীবের একটা হিল্লে হয়ে যায়।

লণ্ঠনের শিখাটাকে কমিয়ে দিয়ে তিনি গুণ্ডা দুজনকে অনুসরণ করে প্রবেশ করলেন চাটুজ্যের পোড়াবাড়িতে।

বাতাস বয়ে চলেছে গাছের পাতার মধ্য দিয়ে শিরশিরিয়ে।

বিশ্রী একটা শব্দ করে একসঙ্গে ডেকে উঠল কতগুলো পেঁচা। তাদের সে ডাক কর্কশ কান্নার মতো।

বটগাছটার ওপর থেকে কতগুলো বাদুড় ডানা ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল।

গুন্ডা দুটো বাড়ির সদর দরজা ও ভাঙা চত্বরটা পেরিয়ে একটা বিরাট ভগ্নস্তূপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

বলরাম মুখুজ্যে ইতস্তত করতে লাগলেন। দরকার কি মিছামিছি ওদের পেছন পেছন গিয়ে। শেষ পর্যন্ত হয় তো প্রাণটাই যাবে!

কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা।

তারপরেই আবার তাঁর মনে লোভ জেগে উঠল। বিপদ দেখে ভয় পেলে জীবনে টাকা আয় করা যায় না!

মুখুজ্যে একবার ভালো করে চারদিকে চেয়ে দেখলেন।

চারদিকেই ঘোর অন্ধকার! আলোর চিহ্ন নেই কোথাও।

গভীর রাতের বুকের উপর প্রেতপুরীর মতো বিরাট ভাঙাবাড়িটা দাঁড়িয়ে।

বাঁ দিকের সরু পথটা ধরে তিনি ভগ্নস্তূপের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়লেন। সারি সারি ভাঙা ঘর। চারিধারে ধ্বংসস্তূপ।

মাঝে মাঝে ভাঙা দালান। তার ফাটলের গা বেয়ে বট, অশ্বত্থ আর নিমগাছেরা জড়াজড়ি করে উঠেছে।

হঠাৎ যেন সৎ করে একটা বিরাট ছায়া তার সামনে দিয়ে ওড়ে চলে গেল।

এ কী ব্যাপার! বলরাম মুখুজ্যে অবাক।

সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে কতগুলো চামচিকা জেগে উঠে চিৎকার করতে লাগল। হঠাৎ তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেই জেগে উঠেছে

তারা।

বলরাম মুখুজ্যের গতি যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

একটা অদ্ভুত আতঙ্ক ভরা চিৎকার এসে তার কানে বাজল। মনে হলো। কেউ যেন কাউকে আক্রমণ করেছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাই সে চিৎকার করছে।

শব্দটা হঠাৎ যেন থেমে গেল।

তারপরেই বিকট একটা অট্টহাসি–হাঃ! হাঃ! হাঃ! অদ্ভুত সে হাসি। সে হাসি যেন আর থামবে না! ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হলো–দুম!

কেউ যেন কোনো জিনিস দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মুখুজ্যে মশাই ভাবলেন নিশ্চয়ই গুন্ডা দুটো নিজেদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ করেছে গুপ্তধনের বখরা নিয়ে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

মুখুজ্যে মশাই এগিয়ে লণ্ঠনের উঁকি মেরে দেখলেন। কিন্তু কিছুই ভালো করে চোখে পড়ল না।

আর একটু এগিয়ে লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দিতেই চোখ পড়ল, দুটি গুণ্ডাই কোনের ঘরের ঠিক সামনের বারান্দার মেঝের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছে। রক্তে চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছে।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন, দুজনের কারও দেহেই প্রাণের চিহ্ন নেই।

হঠাৎ তাঁর কানে এলো ঝনঝন খনখন শব্দ।

ঘরের মেঝেতে পরপর তিনটি ঘড়া বসানো। তিনটিই মোহর পূর্ণ। কতগুলো ইঁদুর আর ছুঁচো লাফিয়ে তার উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠল ঝনঝন–

বলরাম মুখুজ্যের মনে খুব আনন্দ হলো। যাক, গুন্ডা দুটো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরেছে। এবার মোহর তিনিই পাবেন।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা আলো।

অদ্ভুত একটা ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

মুখুজ্যে মশাই সেই বিকট ছায়ামূর্তি দিকে তাকিয়ে কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

ঠিক যেন পাথরে কোঁদা বিরাট দেহ একজন ব্রাহ্মণ। খালি গা। গলায় ধবধবে সাদা পৈতা। কাঁধে একটা চাদর।

সাদা দাঁত বের করে হি হি করে অদ্ভুত হাসি হেসে তিনি বললেন, আমিই কেদার চাটুজ্যে। গত ৫০ বছর ধরে যক্ষ হয়ে এই গুপ্তধন আগলাচ্ছি। গুণ্ডা ব্যাটারা এই ধন নিতে এসেছিল। কিন্তু বদমাইশদের এই ধনের উপর হাত দেবার অধিকার নেই। আপনি গরিব ব্রাহ্মণ। তাই আপনাকে এই ধন দান করলে আমার আত্মার মুক্তি হবে। আপনি আমার পুর্বপুরুষ সঞ্চিত অর্থ তিন ঘড়া মোহর নিয়ে যান। আর দয়া করে গয়ায় আমাদের নামে পিণ্ড দিয়ে দেবেন।

এর পরের খবর আমরা যা জানি, গরিব মুখুজ্যে মশাই হঠাৎ রাতারাতি বড়োলোক হয়ে ওঠেন এবং সর্বদা ধর্মে মতি রাখতেন। গরিব-দুঃখীকে প্রচুর দান করতেন।

একমাস পরে তিনি যক্ষের অনুরোধ মতো গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে এসেছিলেন।

এরপর হানাবাড়িতে আর কখনও ভূতের উৎপাতের কথা শোনা যায়নি। গভীর রাতেও সে পথে চলতে আর কেউ ভয় পেত না।